মেয়েটার বয়েস হয়েছে কর্ত্তা, আর ওই মেয়েটাই চব্বিশ ঘণ্টা চালায় বসে' সেলাইএর কাজ-টাজ করে,—ঘরে সব-সময় থাকি-না-থাকি……ভাই হলেও ও শালাকে আমি বিশ্বাস করি না…… হ্যাঁ—।"

কিন্তু মকবুল তাহার বাঁখারি-ঘেরা খোঁয়াড়ের পাশে বসিয়া ফরসির নলে খাশ-অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে, শহরের বাদশাহী জরদা-দেওয়া পান চিবায়,—এ সব ছোট কথায় কান দিবার মত অবসর এখন আর তাহার প্রায়ই থাকে না।

বিশেষ করিয়া বৎসরের মধ্যে ধান কাটিবার এই সময়টায় মকবুল মিঞার মেজাজ পাওয়াই দায় হইয়া ওঠে। নূতন খড়ের আশায় পুরানো খড়গুলি অনেকেই তখন বিক্রি করিয়া ফেলে, গরু-বাছুরের দুর্ভিক্ষ সুরু হয়, গ্রামের দক্ষিণে গোচারণের মাঠটিকে ত' রেল-ষ্টেশনের ইমারত-অট্টালিকা, দোকান-দানি আর কল-কারখানার মাঝে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না,—ক্ষুধায় আর্ত্ত শীর্ণ কঙ্কালসার গরুবাছুরগুলা একবার ছাড়া পাইবামাত্র হাঁ হাঁ করিয়া লোকের পাকা ধানে গিয়া লাগে। খোঁয়াড়ে টাকা-পয়সার আমদানি হইতে থাকে,—মকবুলের ষোল-আনা পড়্তা পড়িয়া যায়।

এখন আর তাহার দু'চার আনা পয়সা গায়েই লাগে না।

মহতাপ্ গরু লইয়া অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া ছিল। পানের খানিকটা পিক্ ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া মকবুল বলিল, "গণেশ পাঁড়ের গরু নেবার বহুৎ হাঙ্গামা সিং-জি! মাপ কর,—ও আমি নিতে পারব না।"

মহতাপ্ জিজ্ঞাসা করিল,"কেনো লিবে না শুনি ?"

মকবুল আবার খানিকটা পিক্ ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পয়সা দেয় না, উল্টো জবরদস্তি মারপিট্ করতে আসে। ও নিয়ে আমার লাভ কি ?"

এই বলিয়া সে তাহার ফরসির নলে বারকতক্ টান দিল। বলিল, "তার চেয়ে সিধা বাৎ বলি,—এইপথে ইষ্টিশনের খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো—যাও।"

মহতাপ্ গরু লইয়া ষ্টেশনেই যাইতেছিল, ইয়াসিন তাহাকে ফাঁকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলে কি ?"

মহতাপের জবাব শুনিয়া সে তাহার ঠোঁট দুইটি উল্টাইয়া কহিল, "ভয়-তরাসে' মানুষের সাহস কোথা পাবে সিং-সায়েব ? আসছে-বছর আমি খোঁয়াড় ডাক্‌ব —নিলেমে। গরু যত পার দিও তখন। কাউকে 'কেয়ার্' করি না আমি—আমি কাউকে ভয় করি না।"

গরু যে তাহার চালান গিয়াছে গণেশ পাঁড়ে আগেই সেকথা টের পাইয়াছিল। ষ্টেশনের পথে একা পাইয়া মহতাপ্‌কে আগ্‌লাইল,—গণেশ, কিশোরী ও চৈতন। মারপিট্ করিয়া গায়ের জোরে গরু ছিনাইয়া আনিল।

মহতাপ্ অমনি ছাড়িল না; লাঠি দিয়া চৈতনের একটি হাত সে রীতিমত জখম্ করিয়া দিল।

ঘরে গরু রাখিয়া গণেশ তৎক্ষণাৎ চৈতন ও কিশোরীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং সেইদিনের খোলা-কাছারিতে এই বলিয়া নালিশ রুজু করিল যে, জমিদার ও তাহার ছেলে নবীন, অনেক লোক-লস্কর লইয়া সেদিন সদলবলে তাহার ঘর লুট করিতে আসে; এবং লুট-তরাজ না করিতে পাইয়া তাহাকে ও তাহার ছেলে চৈতনকে যৎ-পরোনাস্তি প্রহার করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যায়। অত্যা-চারী জমিদার অত্যন্ত প্রবল। অধীন গরীব। সুতরাং স্বচক্ষে যাহারা এ-ব্যাপার দেখিয়াছে, তাহারাও জমিদারের ভয়ে সাক্ষী দিতে নারাজ। এইবার হুজুর মালিক।

এবং গণেশ নাকি ইহাও বলিয়া আসিয়াছে যে, সে তাহার মান, সম্ভ্রম, ইজ্জৎ, সম্পত্তি, আজ হইতে সবই ওই শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সংবাদটি পত্রে-শাখায় পল্লবিত হইয়া নবীনের কানে পৌঁছিতে দেরি হইল না।

কাহার একটা দেওয়ানী মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য দিতে ও-পাড়ার হারু লাএককে সেদিন আদালতে যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপারটা সে-ই প্রথমে নবীনকে বলে।

"—বেটা খালি আমার দিকে গর্জ্জে' গর্জ্জে' তাকায়, বুঝ্‌লে নবীন? আর-একটু হলেই হয়ে যায় আর-কি—আদালতের উপরেই। নিজেই সাম্‌লে নিলাম শেষে,—বলি, কাজ-কি বেটা ছুঁচো বেহায়া ছোটলোকের সঙ্গে—"

বৈঠকখানাটি সীতাপতিবাবু নিজেই দখল করেন, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে নবীন বড়-একটা তাঁহার কাছ ঘেঁসে না, স্কুলের একটি ঘরে প্রায়ই সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সেদিনও সে বাহিরের উঁচু রকের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল।

হারু লাএক তাহার হাতে-ঝুলানো ফুলকফিটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "হুঁঃ! সস্তা হয়েছে,—সস্তা হয়েছে না আরও-কিছু! এই ত' দেখ্‌ছ কতটুকুন্‌,—দশ পয়সার একটি আধলা কমে ছাড়লে না।"

আদালত-ফেরৎ তখনও সে বাড়ী ঢুকে নাই।

নবীন বলিল, "এখনও বাড়ী ঢোকেননি বুঝি? যান—আপনি বাড়ী যান।"

বলিয়া সে নিজেও উঠিল।

"কই আর গেলাম বাবাজি? এই এত বড় খবর—তোমাকে আগে না জানিয়ে কি আর……এই তুমিই হয়ত বলতে যে হারু খুড়ো আদালতে গিয়েছিল সেদিন, অথচ খবরটি আমায় দেয়নি।—"

•

সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। সীতাপতিবাবুর বৈঠকখানায় নাতি-ঠাকুরদা'র বৈঠক্ বসিয়াছিল। নিজে তিনি একটি চৌকির উপর আলোর সুমুখে বসিয়া কাহাকে একখানি চিঠি লিখিতেছিলেন, এবং তাঁহার দৌহিত্র ফটিক, চোখের সুমুখে একটি বর্ণপরিচয়ের বই খুলিয়া সুমুখে আলোর পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া ছিল।

লাল ও হলুদ রঙে চিত্র-বিচিত্রিত ছোট একটি ফড়িং উড়িয়া উড়িয়া ক্রমাগতই আলোর কাঁচে মাথা ঠুকিতেছে। ফটিকের ইচ্ছা, তাহাকে একবার সে হাতে করিয়া ধরে, এবং সেজন্য তাহার হাত দুইটি অনেকক্ষণ হইতেই নিশ্‌পিশ্‌ করিতেছিল।

বহুক্ষণ চেষ্টার পর সত্যই সে ধরা পড়িল। ফটিক তাহার বাঁ-হাতের সুন্দর কচি দুইটি আঙুলের ডগায় অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে ফড়িংটিকে চাপিয়া ধরিয়াই আপনমনে বলিয়া উঠিল, "ধরেচি, এই দেখ দাদু,—ইরে বাবা রে!"

ফড়িংটি উড়িয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবুর চিঠি লেখা বন্ধ হইল না। হেঁট্‌মুখে লিখিতে লিখিতে কহিলেন, "ছেড়ে দাও। ছিঃ, ফড়িং ধরে না। ওদের লাগে।"

অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ফড়িংটিকে সে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। বলিল, "হ্যাঁ—ওদের লাগে, ওরা যেন মানুষ, ওরা যেন ভাত খায়!……বা রে! এর আবার দুটো চোখ আছে—!"

চোখ দুইটি দেখা তাহার শেষ হইলে, ফড়িং-সমেত হাতখানি ফটিক তাহার দাদুর মাথার কাছে অত্যন্ত সন্তর্পণে লইয়া গিয়া বলিল, "দেব ছেড়ে? দিব্যি পাকা-পাকা চুল খাবে।"

এই সময় সুমুখে হঠাৎ পায়ের শব্দ হইতেই ফটিক চাহিয়া দেখিল, তাহার মামা নবীন ঘরে ঢুকিতেছে। ভয়ে ফটিকের হাতের আঙুল দুইটি আপনা হইতেই আল্‌গা হইয়া গেল, পাকা চুল খাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া ফড়িংটি উড়িয়া পলাইল। ছেলের ক্ষোভের আর অবধি রহিল না; পড়িবার ছলে বর্ণপরিচয়ের পাতায় 'ফ'-এর নীচে ফড়িংএর ছবিখানি খুঁজিবার জন্য একাগ্র মনোনিবেশ সহকারে তাহাকে পুনরায় মাথা নীচু করিতে হইল।

নবীন ঘরে ঢুকিয়াই নিঃশব্দে একবার দেওয়ালের আলমারি, একবার টেবিল, একবার জানালার উপরের কাগজপত্রগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। দোয়াত, কলম, কিম্বা কাগজ-পত্রের প্রয়োজন হইলে এমনি করিয়াই সে এই ঘরে আসিয়া ঢুকে, এবং এমনি নিঃশব্দেই নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া যায়।

সীতাপতিবাবু তখনও ঘাড় হেঁট্ করিয়াই লিখিতে-ছিলেন। 'দাদু'র ফড়িংএর উৎপাত হঠাৎ এত সহজে বন্ধ হইল কেমন করিয়া, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, লিখিতে লিখিতে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন? গেল ত' উড়ে?"

ফটিকের কাছ হইতে জবাব আসিল না। কথা কহিল নবীন।

বলিল, "আমাদের নামে নালিশ করেছে।"

সীতাপতিবাবু ফটিকের জবাব না দিবার অর্থ বুঝিলেন। মুখ তুলিয়া কহিলেন, "কেন? কে?"

নবীন টেবিলের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "গণেশ পাঁড়ে। আমরা নাকি লোকজন নিয়ে ওদের মেরে' এসেছি সব।"

"করুক্, কিচ্ছু হবে না।"

বলিয়াই তিনি আবার তাঁহার কাজে মন দিলেন।

নবীন বলিল, "আমাদেরও নালিশ করা উচিত,—চাপ্রাশীর হাত থেকে গরু ছিনেয়ে নিয়েছে বলে'।"

"উঁ "

"আমরাও ওর নামে নালিশ করব।"

ঘাড় নাড়িয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "উঁহু, আমাদের আর ও-সব হাঙ্গামায় গিয়ে কাজ নেই।"

নবীন বলিল, "আপনি বুঝ্ছেন না, এম্নি করে' ওর আস্পর্দ্ধা বেড়ে' যাচ্ছে দিন-দিন।"

সীতাপতিবাবু হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন, হাতের কলমটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বাড়ুক্, তোর কি? তোর এত মাথাব্যথা কিসের?—নালিশ-মোকর্দ্দমা করা এমনি মুখের কথা কি-না! একটি হতে হতে দশটি হবে,—খরচ কত!"

"খরচ ত' এসময় কিছু হবেই।"

সীতাপতিবাবুর রাগের মাত্রাটা যেন আরও একটু-খানি বাড়িয়া গেল।

"—এঁঃ! হবেই। অম্নি বলে' দিলেই হলো—হবেই! পাজি, শূয়োর, গাধা কোথাকার! পাই কোত্থেকে, আমি পাই কোত্থেকে টাকা? দাদা এক পয়সা দেবে না —তা জানিস?"

ফটিক অত্যন্ত ভয় পাইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

অতি কষ্টে রাগ সম্বরণ করিয়া নবীনও সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল—

"বেশ তবে তাই হোক্। ওর যা-খুশী তাই করুক্।"

বইএর তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "উঁ, দেখে যা। লাটের আদায় হচ্ছে মোট ন'শ টাকা—তাও জোর-জবরদস্তি; আর দাদা লিখেছেন, এই ছাখ্—।"

এই বলিয়া চিঠির কয়েকটি লাইনের উপর আঙুল দিয়া তিনি পড়িলেন, "পত্তনিদারের বার-শ' টাকা লাট্ থেকে যে-কোন রকমে আদায় করা চাই। আদায় তোমরা করতে জান না, আর সেই জন্যেই বছর-বছর তিনটি শ' করে' টাকা আমায় লোকসান দিতে হয়।"

চিঠিখানি পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এর চেয়ে আদায় আবার কেমন করে করতে পারে মানুষে? কোন্ প্রজা উচ্ছেদ করব? কাকে মার-ধোর্ করব গিয়ে?—যার যা খুশী তাই করুক, —যে মরে মরুক্—।"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, নবীন চলিয়া গেছে।

মনোহর বাগ্‌দি সেদিন আবার তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ধরিয়া আনিল।

স্ত্রী কিছুতেই আসিতে চায় না।

মনোহর বলে, "সেটি হচ্ছে না বাবা, বারে-বারে কেবলই ফাঁকি দিচ্ছ তুমি।"

এই বলিয়া সে পথের অন্ধকারে জমিদারের দালান-বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া বলে, "বাবুদের ওই চিল্‌-কোঠায় তালা-চাবি মেরে' আট্‌কে রাখা হবে, দেখি, এবার কেমন করে' পালাও।"

গরবী তাহার শক্ত হাতখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করে। চুড়ি পরা নরম হাতখানা মুস্‌ড়াইয়া ফেলিতে মনোহরের বেশিক্ষণ সময় লাগে না, ধীরে-ধীরে একবার পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দিতেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গরবী তাহার পিছনে-পিছনে চলিতে থাকে।

কিন্তু এত করিয়াও মনোহর তাহাকে তাহার ঘরে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না। বছর খানেক্‌ তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, মাঝে একটা ছেলে হইয়াও নাকি মরিয়া গেছে;—গরবী বলে, "তুই আবার কাউকে শাঙা কর্‌ উনোন্‌-মুখো, আমি তোর ঘরে থাক্‌ব না।"

এবং সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সে পালায়।

স্কুলের একটি ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছিল। ভেজানো-দরজাটি ধীরে-ধীরে ঠেলিতেই মনোহর দেখিল, নবীন একটি চেয়ারের উপর জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, টেবিলের একপাশে নামানো লণ্ঠনের পলিতাটা খাটো করিয়া দেওয়া হয় নাই,—কালি পড়িয়া কাচটা অন্ধকার হইয়া গেছে।

মনোহর বলিল, "এই যে হুজুর! বেটিকে আজ আবার ধরে' এনেছি। সেকি এখানে আজ্ঞে,—উ—ই সেই ভালুক-মারার পুল থেকে'—"

বৎসরের মধ্যে বহুবার এই মোকর্দ্দমাটি তাহার হাতে আসে।

মুখ ফিরাইয়া নবীন বলিল, "তবে আর ভাবনা কি আমার! 'কেতাত্ত' করে' দিলেন আর-কি!—যা, বাবার কাছে যা,—আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস্‌ মর্‌তে?"

"উনিই যে পাঠিয়ে দিলেন বাবু।—ব'স্‌ হারামজাদী ব'স্‌ এইখানে!"

গরবীর হাতখানা সে আর-এক প্যাঁচ ঘুরাইয়া দিয়া চৌকাঠের বাহিরে তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিল।

নবীন আর কোনও কথা বলিল না, সুমুখে দেওয়ালে-টাঙানো জ্যামিতির ত্রিভুজ-আঁকা ছেলেদের 'ব্লাক্‌-বোর্ড'-টার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মনোহর বলিল, "মাগীর শয়তানী বুদ্ধি দেখেছেন বাবু?—এই দেখুন—……তোমার পেটে এত বুদ্ধি বাবা!" বলিয়াই সে চট্‌ করিয়া একবার গরবীর মুখের পানে তাকাইয়া লইল।

নবীন তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইতেই মাটির একটা মালসা ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মনোহর বলিল, "কাপড়ের একটি বিঁড়ে পাকিয়ে এইটি ও চড়িয়ে নেয় মাথায় —এর ওপরে আগুন থাকে, আর ওর আঁচলে থাকে খানিকটে ধুনো। অন্ধকারে বেরাস্তা ধরে' পথ চলে, আর মাঝে-মাঝে একমুঠো করে' ধুনো ওই আগুনে ছিটিয়ে দেয়,—দপ্‌ করে' জ্বলে' ওঠে, আবার খানিক্‌ পরে নিবে যায়, আবার ছিটোয়, আবার জ্বলে, আবার নেবে,—লোকে ভাবে, শাকচিন্নি পেত্তা-টেত্তা হবে বুঝি। ভয়ে কেউ আর ও-পথ মাড়ায় না,—দিব্যি নিশ্চিন্তি ও আপনার সিধা চলে' যায়।—শুনুন, একবার ওর বিদ্যেটি শুনুন হুজুর! তাই ত বলি,—এই গেল, এই গেল, ধর্‌, ধর্‌ ধর্‌—ছুটলাম পিছু-পিছু, বাস্‌ আর নেই!"

নবীন বলিল, "ওকে ছেড়ে' দে—ওর যেখানে খুশী চলে যাক্‌।"

সেই সামান্য আলোকেই দেখা গেল গরবীর চোখদুটা আশায়, আনন্দে হঠাৎ একটুখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মনোহর বলিল, "ছেড়ে' দেব? বিয়ে-করা ইয়ে ছেড়ে' দেব কি আজ্ঞে? না আজ্ঞে, তা আমি—ওকে ত' আমি মাগ্‌না আনিনি—বিয়ে করে' এনেছি হুজুর!"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নবীন বলিল, "এনেও ত' পারিস্‌নি রাখ্‌তে,—ও থাক্‌বে না।"

"থাক্‌বে না কি হুজুর? আল্‌বাৎ থাকবে। বিয়ে করেছি—ওর বাপ্‌ থাক্‌বে।"

নবীন রাগিয়া উঠিল।

"তবে আবার আমার কাছে কি জন্যে এসেচিস হারামজাদা? তাই রাখ্‌গে যা,—যেমন করে' পারিস্‌ ধরে' রাখ্‌গে।"

ঘাড় নাড়িয়া মনোহর বলিল, "সেই হুকুমটি আমি চাইছি হুজুর! ধরে' আমি ঠিক্‌ রাখ্‌বই। আচ্ছাটি করে' বেঁধে' আমি ওকে ঘরে পুরে' রাখ্‌ব সারাদিন,—দেখি কেমন করে' পালায়। আর—আচ্ছাটি করে' পা থেকে' মাথা পর্য্যন্ত······সেই হুকুমটিই আমি চাইছি হুজুর,—তখন বলবেন না যে, তুই কেন মেরেছিস হারামজাদা বল্‌!"

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মনোহর বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "এতেও যদি কোনদিন পালায় হুজুর, সন্ধান করে' আমি ঠিক্‌ খুঁজে বার করবই।—তারপর আমি দেখে' নেব—"

এই বলিয়া সে একটা বেফাঁস্‌ খারাপ কথা তাহার সেই বিবাহিতা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিল।

নবীন রাগিয়াই ছিল, এইবার তাহার আর সহ্য হইল না, মেঝে হইতে চটিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে মনোহরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাচ্ছে-তাই আরম্ভ করেছে শূয়ার! বে-যবানী মুখখিস্তি দেখ,—মহতাপ্‌।"

ইস্কুলের অন্ধকার চালায় মহতাপ্‌ কোথায় না জানি বসিয়াছিল, ডাক শুনিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাঁধ্‌! বেঁধে রাখ্‌ এদের ওই খুঁটিতে!—দশ টাকা জরিমানা দিক্‌,—দিয়ে উঠে' যাক্‌! হারামজাদা, পাজি, শূয়োর, ছোটলোক, চোয়াড়!—মুখখিস্তি করবার আর জায়গা পাওনি? কিছুতেই ছেড়ো না তুমি মহতাপ্‌!"

নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। রাগে তাহার মুখ দিয়া তখন আর কথা বাহির হইতেছিল না।

দরজা দিয়া নবীন পার হইতে যাইবে, মনোহর পা-দুইটা তাহার জড়াইয়া ধরিল।

"—দোষ করলে ওই মাগী, আর দণ্ড হলো আমার! এ কখনই হুজুর······ও আমাকে লেজে-গোবরে করেছে আজ্ঞে······এই ছটি মাস······আমার কি আর যবান-বেযবান······মাথার ঠিক্‌······"

আরও কত-কি সে বলিতে যাইতেছিল, নবীন তাহার পা-দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া স্কুলের উঠানে গিয়া নামিল। বলিল, "বেশ, তবে মাগীই দিক্‌! ও-সব ন্যাকামি শুন্‌তে চাই না আমি। নাংটামি করবি অন্য গাঁয়ে গিয়ে—এ গাঁয়ে চল্‌বে না। জরিমানা করেছি যখন—টাকা চাই আমি, টাকা চাই! তুমি ছেড়ো না মহতাপ, খবরদার বলছি, দশটাকার এক-পয়সা কমে ছেড়ো না।—নষ্টামি করবার আর জায়গা পাওনি শূয়ার?"

মনোহর তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "শুন্‌লি ত? এ-গাঁয়ে ও-সব চল্‌বে না বাছাধন—তোর সেই বাপের ঘরে চল্‌তে পারে।—আর যাবি কখনও? আর যাবি? পালাবি?"—বলিয়া সে দাঁত-কট্‌মট্‌ করিয়া গরবীর হাতখানা আর-একবার মুচ্‌ড়াইয়া দিল।

গরবীর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। হেঁট-মুখে সে জড়সড় হইয়া বসিয়াই রহিল। চোখ দিয়া তাহার টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইতেছিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মারছিস্‌ কেন, ওকে মারছিস্‌ কেন হারামজাদা?"

"না মারলে টাকা বেরোয় আজ্ঞে? না মারলে মেয়ে জব্দ হয়?"

মনোহর তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া নবীনের সুমুখে হাত জোড় করিয়া বসিল।

নবীন বলিল, "টাকা কোথা পাবে, ও টাকা কোথা পাবে?"

"পাবে। যদি না পায়—হুজুর—" বলিয়া মনোহর সেখান হইতে উঠিয়া নবীনের কাছে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ভাগে-আবাদে চাষ-বাস্ করে' ধান-পানি ত' চারটি পেলাম হুজুর,—সেই কটি বিক্রি-সিকি করে' না হয় আমিই দিয়ে দিলাম ধরুন! কিন্তুক্, বলুক্ ও,—আমার ঘরে থাক্বে। ধম্মাবতারের সাক্ষাতে বলুক্ যে, খেটে' খুটে সে টাকা ও আমায় শুধ্‌বে!······আর সে-ই যে সেই হুকুমটি আমাকে দিন্, —ঠেঙ্গার চোটে বাঁদর নাচাতে পারি আজ্ঞে,—ও ত' কোন্ ছার! ও ত মেয়েমানুষ! কতটুকুই-বা ওর 'জিউ'!"

"যা খুশী তাই করগে—মর্ বাঁচ্, কিছু জানিনে আমি। জরিমানার টাকা আমার ফেলে দিয়ে তারপর উঠে যা।"

বলিতে বলিতে নবীন পিছন্ ফিরিয়া স্কুলের আর-একটা ঘরের চালায় গিয়া উঠিল।

মনোহর বলিল, "শুন্‌লি ত'? হুজুর কি বল্‌লেন শুন্‌লি ত' গরব?"

মহতাপ তখনও তাঁহাদের আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাবু চলিয়া যাইতেই তাহার একটুখানি সাহস বাড়িল; রুক্ষ কর্কশ ভাষায় মনোহরকে জানাইয়া দিল যে, জরিমানার টাকা তাহার তৎক্ষণাৎ চাই-ই, এমনকি, এই শীতে যদি তাহাকে আর মিনিট-খানেক্ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাকেও কিছু লাগিয়া যাইবে।

মনোহর তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "এই যে মহাদেব-সায়েব, সেই কথাই ত' বাবা······আচ্ছা তুমিই ওকে বেশ করে' বুঝিয়ে-সুজিয়ে বল না ভাই!"

স্কুলের একটা কুঠুরির ভিতর খিল বন্ধ করিয়া হেড-পণ্ডিত মহাশয়ের পাশাখেলা চলিতেছিল।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়া নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টা বাজ্‌লো পণ্ডিত-মশাই?"

নর্ম্যাল-পাশ এই বাংলা পণ্ডিতটি বিদেশী মানুষ। মাসিক কুড়ি টাকা মাহিনা দিয়া তাঁহাকে এখানে আনিতে হইয়াছে। স্কুল ঘরেই রাত্রিবাস করেন, পেসন্ন-বুড়ীর ঘরে অভ্যাগত হিসাবে পয়সা দিয়া দিনে খাইয়া আসেন, রাত্রিটা দোকানের মুড়ি-মুড়কির উপরেই চলে।

নবীনের গলার আওয়াজ পাইবামাত্র পণ্ডিত মহাশয় দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিয়া দেওয়ালে-টাঙানো জাপানী-ক্লকটার ইংরেজি-অঙ্কের অক্ষরগুলা মনে-মনে গুনিতে আরম্ভ করিলেন।

হারু লাএক ইহারই মধ্যে ফুলকফিটি ঘরে রাখিয়া আসিয়া কখন যে পণ্ডিতের সঙ্গে পাশায় মাতিয়াছিল কে জানে।

পাশা খেলা ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে উঠিয়া আসিল।

ঘড়ি দেখিয়াই নবীন চলিয়া যাইতেছিল, হারু লাএক তাহার পিছনে-পিছনে অন্ধকার উঠানের মধ্যে গিয়া বলিল,—"শোন বাবাজি,—একটা কথা আছে।"

"কি?" বলিয়া নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লাএক বলিল, "ঠিক! যা ভেবেছিলাম তাই।"

বলিয়াই সে একবার অন্ধকার উঠানের এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া দেখিতে গিয়া দূরে মনোহর-গরবীর উপর নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিল, "ওরা কে?"

পাশাখেলার ঝোঁকে এতক্ষণ কিছুই তাহারা টের পায় নাই।

নবীন বলিল, "কেউ নয়। বলুন—!"

লাএক একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া চুপিচুপি কহিল,

"গণেশ তলে-তলে খবরটি ঠিক রেখেছে যে আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম। বাড়ী যাচ্ছি,—গণেশের দরজাটা কোনরকমে পেরোলাম। তারপর, যেমনি কামার-শালের কাছাকাছি আসা, বুঝ্‌লে কিনা—অম্‌নি টের পেলাম, কে-একটা লোক অন্ধকারে সড়াচ্ করে' ঢুকে' পড়লো—পাঁড়েদের সেই বেলগাছ-ওয়ালা পড়ো-বাড়ীটায়। লোকটার হাতে একটা লাঠি ছিল। বুঝ্‌লে কিনা? ডাকলাম—কে! কে! বাস্! সব চুপচাপ্! আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভয় হলো। অন্ধকারে ওই অশথ্-গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি,—ঠিক! ওরাই দু' বাপ্-বেটা। অনুমানে বোধ হলো যেন আমার কথাই হচ্ছে। ভাবলাম, বলি, যাই—আমাদের বাবাজিকে একবার বলি গিয়ে। বুঝতাচ্ছ? রোজই ত' আমাকে অন্ধকারেই যাওয়া-আসা করতে হয়,—তাই ভাবছি,—বেটারা যদি আমাকেই শেষকালে—"

এতগুলা কথা একটানে বলিতে গিয়া লাএক যেন হাঁপাইয়া পড়িল।

নবীন বলিল, "কি করতে হবে আমায়? আমি নিজে দাঁড়িয়ে দিয়ে আস্‌ব?"

কথাটার অর্থ লাএক ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "উহুঁ, হট্ করে' অমন সাহসটি কোনদিন করো না বাবাজি! রাগটা যেন তোমার আর আমার উপরেই একটুখানি বেশি বলেই মনে হয়।"

এই বলিয়া হারু লাএক অন্ধকারে আর-একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল, তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি একটুখানি সাবধানে থেকো বাবাজি,····আমায় দাঁড়িয়ে দিয়ে আস্‌বার কথা বলছিলে, কিন্তু এত' আর এক-আধদিনের মামলা নয় বাবাজি—বারমাস ত্রিশটি দিন যে আমায় এখানে আস্‌তে হয় বাপ্। দিনান্তে তোমাদের খবরটি একবার করে' না নিলে কেমন যেন কিছুই আমার ভাল লাগে না।—তোমার একটা লোক-জন—সেই যে মহাদূত না কে,—সেই তাকেই যদি একবার······বুঝ্‌তাচ্ছ?

বুঝিতে নবীন সবই পারিতেছিল। ভয় সে অন্ধকারে চিরকালই পায়।

নবীন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া লাএক আবার বলিয়া উঠিল, "রোজ এই রাত ন'টার সময়—এইখানেই,—এই আমাদের পণ্ডিত-মহাশয়ের ঘরে······জ্যোৎস্না রাত হলে আর ঘর পর্য্যন্ত যেতে হবে না, অশথ্-তলা পর্য্যন্ত গেলেই—বুঝ্‌লে কিনা বাবাজি,—বলে' দিও তাহ'লে মহাদূতকে।"

নবীন বলিল, "তার চেয়ে অন্ধকারে আপনি বেরোবেন না লাএক মশাই, আপনাকে রোজ দাঁড়িয়ে দেবার মত লোকজন এখনও আমার এত সস্তা হয়নি—বুঝ্‌লেন?"

হারু লাএক একেবারে যেন আকাশ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, তাও ত' ঠিক্, সেকথাও সত্যি,—কাজ কি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে,—হ্যাঁ, দরকারই-বা কি······না কি বল বাবাজি—?"

কিন্তু বাবাজি তখন অনেক দূরে।

অতি তুচ্ছ সংসারের একটি ঘটনা লইয়া ঝগড়া বাধে—এমন প্রায় রোজই।

বৌ বলে, "ভাতে হাত বাড়াবার সময় শু'য়ে হাত বাড়িও। কানা হও, কানা হও, দুটি চক্ষের মাথা খাও।"

ঠাকুরঝি বলে, "আ—। তাও যদি না কিল্-দুমা-দুম্! কেন, তুমি কানা হও না বৌ? আমরা ভাইএর বিয়ে দিই।"

নবীনের বৌ বলিল, "তোমাকে ত বলিনি ঠাকুরঝি—যাকে বলুচি তাকে বলচি।"

বড় মেয়েটা কাছে ছিল না, কোলেরটার বয়স—বছর আড়াই। তাহারই একটা হাতের নোলা ধরিয়া টানিতে টানিতে রান্না ঘরের দিকে এই বলিয়া সে চলিয়া গেল যে মেয়ের ছেলেই 'সগ গো' দেবে, আর ছেলের মেয়ে যে

কুড়িয়ে-পাওয়া। তাই আমার মেয়ের দুধ—রোজ রোজ বেরালে খায়। চোখের মাথা খেয়ে কানা হয়েছেন সব, —কেউ আর দেখতে পায় না।......

কিন্তু শাশুড়ীর কানে টনক্ বাজিল।

নূতন রাঁধুনীটি কোন কাজের নয়। যাহাকে কম করিয়া দেওয়া উচিত, তাহাকেও বেশি দিয়া ফেলে,—মাত্রাজ্ঞান তাহার মোটেই নাই। তাহাকেই কয়েকটা সৎপরামর্শ দিবার জন্য তিনি রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। বৌএর কথাটা কানে যাইবামাত্র চট্ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

বৌ তাঁহার ঠিক্ সামনেই পড়িয়া গেল। মুখে আর তিনি কোনও কথা বলিলেন না, তৎক্ষণাৎ বাঁহাতের দুইটি আঙুল দিয়া বৌএর হাড়-ওঠা গালের চামড়াটা টানিয়া ধরিলেন, এবং অতি সত্বর সুমুখের আখা-শালে তাহাকে টানিয়া আনিয়া জলন্ত একটা চ্যালা কাঠ আখা হইতে বৌএর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "দেব ধেসে'? দেব চোখ দুটো কানা করে' সব্বনাশীর? তোর বাবা কানা হোক্, তোর ভাই কানা হোক্, তোর সাতগুষ্টি কানা হোক্—চোখের মাথা খাক্, আমরা কানা হতে যাব কিসের লেগে' হারামজাদী?"

জলন্ত ওই পোড়া কাঠটা তাহার চোখে আসিয়া লাগা কিছুই বিচিত্র নয় ভাবিয়া বৌ তাড়াতাড়ি তাহার গাল হইতে শাশুড়ীর হাতখানি টানিয়া ছাড়াইয়া দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল।

শাশুড়ীও বোধকরি একটুখানি ভয় পাইয়াই হাতের কাঠটা বৌএর গায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

বৌ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল, কাঠটা তাহার গায়ে লাগিল না। কিন্তু নখের ঘায়ে গালে তখন তাহার রক্ত ঝরিতেছিল। তাহারই যন্ত্রণার চোটে বোধ করি বৌ আর চুপ করিয়া রহিল না, সুমুখে কাঁসার একটা বড় ঘটি পড়িয়াছিল, তাহাই সে তাহার শাশুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

ঘটিটা তাঁহার হাঁটুর এমন জায়গায় গিয়া লাগিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন,—ছুটিয়া গিয়া যে সর্ব্বনাশী বৌকে ঘা-কতক্ বসাইয়া দিয়া আসিবেন তাহারও আর অবসর মিলিল না।

নবীন খাইতে আসিয়া দেখে, মা তাহার রান্নাঘরে রাঁধুনীর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছে। দিদি তাহার খাবার ধরিয়া দিল।

দিদি বলিল, "বৌ ত' আজ আর-একটু হলেই মাকে দিয়ে ছিল খুন করে'।"

প্রতিদিনের মত নবীন গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল,—কোন জবাব দিল না।

দিদি আর একবার রুটি দিতে আসিয়া কি একটা কথা যেন তাহাকে বলিতে গেল, কিন্তু নবীনের ভাবগতিক্ দেখিয়া সেবার আর তাহা বলা হইল না।

তৎক্ষণাৎ আরও খান্-কতক্ রুটি লইয়া আসিয়া কথাটা বলিবার জন্য সে উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। এবং পুনরায় তাহার থালার উপর রুটি দিতে গিয়া তাহা বলিয়াও ফেলিল—

"গয়লা-বৌ এর ঘর থেকে দুধ আমি আধ সের কিনে আনালাম। বৌ বলে, আমার ছবি লবির ভাগ কেটে নিয়েচিস্। ফটিককে বলে কিনা সে মরে' যাক্, তা নইলে মেয়েরা আমার—......উঠ্‌লি যে এরই-মধ্যে? হয়ে গেল খাওয়া?"

বোবার মত চুপ করিয়া নবীন আঁচাইবার জন্য উঠিয়া গেল।

দূর হইতে মা বলিল, "ওরও যে মতিচ্ছন্ন ধরেছে দেখ্‌ছি।"

দিদি তাহার পরিত্যক্ত থালাটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "একটি রুটি খেয়েছে মোটে—। ফটিক ঘুমোলো নাকি?

অন্ধকার গভীর রাত্রে নবীনের ছোট মেয়েটা কাঁদিয়া উঠিল।

নবীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বলিল, "কাঁদিও না বল্‌ছি, চুপ করাও, নইলে খুন করে' ফেল্‌ব।"

"কাঁদছে ত' আমি কি করব? কাঁদিস্‌নে হতভাগী, কাঁদিস্‌ নে।" বলিয়া বৌ তাহার পিঠের উপর ভিট্‌ করিয়া এক চড়্‌ মারিয়া তাহাকে আরও কাঁদাইয়া দিল।

নবীন উঠিল। সুমুখের দরজাটা খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া সে ছাতে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইতে আর বেশি বিলম্ব নাই। অত্যন্ত শীত করিতেছিল। দূরে ষ্টেশনের আলো জ্বলিতেছে।

নবীন অত্যন্ত ত্রস্তপদে খোলা ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। মাথার ভিতর কিসের যেন একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গাঁয়ের পাশে, রাঙামাটির পাকা রাস্তার উপর দিয়া, ব্যাপারীদের বোঝাই-গাড়ীগুলা বোধ করি শহরে চলিয়াছে।

চিল্‌-কোঠার পাশে নবীন তাহার আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া বসিল। গাঁয়ের কয়েকটি খড়ো-ঘরের চাল ছাড়া আব্‌ছা-অন্ধকারে দূরের আর-কিছুই তাহার নজরে পড়িল না।

ক্রমশ—

সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে—

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে
পথ আজি নির্জ্জন,
বাদলা-পোকার ফূর্ত্তি নিয়ে
জাপানি লণ্ঠন!

কদম্বে আজ শিথিল রেণু
সুবাসে ভুর ভুর,
বর্ষাশেষের বাদল বাজায়
আজ বেহায়া সুর!

ঘরের কোণে ঝাপ্‌সা আলোয়
জমকালো মজলিশ,
চেঁচিয়ে কথা কইতে বাধে
—আধ-ফোটা ফিস্‌ফিস্‌!

ঘাঘ্‌রি বিনা কাজরী নাহি
নেইক কাজল কালো,
দুটি প্রাণীর মজ্‌লিশই আজ
সবার চেয়ে ভালো!

বীণার তারে মরচে ধরা
কাজ কি পাড়াপাড়ি,
আজকে নীরব ঠোঁটের সাথে
ঠোঁটের কাড়াকাড়ি!

মেঘলা-মোহ ধরে যে আজ
কপোত কূজনে,
বর্ষাশেষের বেহায়া রেশ
শুন্‌ছি দুজনে!

চিকুর চেয়ে চম্‌কে দেবে
করোনা চিক্‌ ফাঁক,
আজ দেওয়ানা দেয়ার শোন
দিল-দরদী ডাক!

দরিয়াতে আজ কই দাদুরি—
হায়রাণ সব চুপ,
মেঘলা দিন আজ দাঁড় ফেলে যায়
আঁধারে ঝুপ ঝুপ!

বাদলা-পোকার পাৎলা পাখা
পড়ছে খসে খসে,
সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে
শুন্‌ছি বসে বসে;—

হাল্‌কা বেণীর বন্ধনী আজ
আল্‌গা করেই রাখ,
শুধু শীতল অধর দিয়ে
নীরব চুমা আঁক।

নর-নারী

শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বনের মানুষ পারিবারিক বেষ্টনী ও গোষ্ঠীর প্রসারের মধ্য দিয়ে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সমষ্টি পরস্পরের স্বার্থ ও লভ্য রক্ষণের ইচ্ছায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কত শত বিধি প্রচার করতে লাগল। তার ফলে যুগ যুগান্ত ধরে মানব সমাজে বিধিবদ্ধ জীবনের যে রূপ দেখলুম তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি করুণ।

মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে অসাধ্য নিবৃত্তির পথে চালনার জন্যে কঠোর নির্মম পেষণ, ব্যবহারিক সত্যকে চিরন্তন করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক জীবনের কাছে বলি, স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ এই ব্রতে আপনাকে আহুতি দিয়েছে, ভেবেছে এই উপায়েই বুঝি বা সেই সত্যের সন্ধান মিলবে, যে-সত্যের আলোকে ব্যক্তিগত পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে গোষ্ঠী-জীবনের উন্মেষের কোন বাধা কোন দিনই ঘটবে না, একের প্রসার অন্যের পরম লাভ বলে গণ্য হবে।

কিন্তু ফল হলো উল্টো। ত্যাগের মহিমায় ব্যক্তি যখন উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌লো, স্বার্থের অপরিতৃপ্ত সাধনায় সমাজ তখন বীভৎস রূপ ধারণ করলো। মাত্রা রইল না, ছন্দ কেটে গেল। সুন্দরের প্রকাশের জন্যে মহীয়ান ত্যাগের ফল কুৎসিতকে সৃষ্টি করলো।

আবার আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। ব্যক্তি বল্লে, এতদিন ধরে যে রুদ্র-সাধনা করেছি সুন্দরকে সংসারের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে,—তা ব্যর্থ হোল ; সুধার পাত্র অপূর্ণ রইল ; কার পায়ে সব মনুষ্যত্ব লুটিয়ে দিলুম, কোন্ প্রাণহীন রূপহীন যন্ত্রের পায়ে ?

তাই মানুষ রেগে উঠে বল্‌ল, স্বার্থরক্ষার জন্যে যে বিধি তৈরী হয়েছে সে সব কিছুই মান্‌ব না, আরামের ব্যবস্থা চূর্ণ করবো সহজ প্রাণবান সত্য লাভের জন্যে। আমার সহজ বুদ্ধি, আমার প্রাণ—চায় রূপ, চায় রস, কত না তার সৌন্দর্য্য সাধনার তৃষ্ণা, সংখ্যাতীত তার মনের বিচিত্র রস ভাণ্ডারের আয়োজন,—সমস্তই তোমার বহুজন-হিতায় মেকী মন্ত্রের কাছে নীচু করে দেবো, তা শোভন হতে পারে না, মঙ্গল হতে পারে না, সুন্দর তো নয়ই ; অনুশাসন নির্দ্ধারিত যান্ত্রিক সম্বন্ধ মানি না, মানি প্রাণের গভীর টান প্রাণের প্রতি। বাইরের বস্তুকে অন্তরের নিত্য বস্তুর সঙ্গে গোঁজামিলন দিয়ে যারা আমাদের বুদ্ধিকে এতদিন ধরে উপহাস করে এসেছে তাদের মানি না, মানি সুসংযত সুন্দর প্রকাশ, যা ধ্যানী ভোগীর স্বচ্ছ অন্তরের প্রতিচ্ছবি।

* * * *

দেহ-ধর্ম্মের নিয়মই আলাদা। তাকে অস্বীকার করলে চলে না। তার আপনার জগতে এমন কতকগুলো অভাব আছে, যা পূরণ করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। নইলে অনর্থ ঘটে।

কিন্তু যৌন সম্বন্ধের ব্যাপারে দেখি সমাজ অহেতুক কতকগুলো দুর্ভেদ্য গণ্ডী টানলো।

স্বভাবের নিয়মে দেখতে পাই, যে নিয়ম যেখানে গতির পথে বাধা নয় বরং পরিপোষক, সেখানে সেই নিয়ম অনুযায়ী কার্য্যেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। আর সমাজের নিয়মে দেখা যায় কেবলই বাঁধুনীর পর বাঁধুনী, নিয়মের গ্রন্থি শত সহস্র পাকে মনকে অনুক্ষণ আবেষ্টন করে আছে।

নীতি বলতে বোঝায় কি? আমার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকে যা সহায়তা করে তাই আমার পক্ষে নীতিমূলক, তোমার বিকাশকে যা সাহায্য করে তা তোমার পক্ষে নীতিমূলক। ভিন্নমুখী বহু পথের সাধনায় কোন বিশেষ নীতিকে একান্ত বলে মানা যুক্তিসঙ্গত নয়।

সামজিক বিধি-বিধান সম্বন্ধেও সেই কথা। এক যুগের ব্যবস্থা আর এক যুগে চলে না। মনুর বিধানে সমাজের যে ছবি পাওয়া যায় তাকে চিরন্তনী করে তুলতে যে কোন নীতিবাগীশও আজকের দিনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠবেন বলে বিশ্বাস। কাল বিশেষে অনেক সুনীতি পরিচায়ক রীতি দুর্নীতির পরিচয় দেয়।

* * * *

যৌন সম্বন্ধে কড়াকড়ির বিধানের সূত্রপাতে দেখতে পাই যে পুরুষ লালসায় উন্মত্ত হয়ে সুন্দরী স্ত্রী ভোগেচ্ছায় হরণ করেছে। তারপর নিতান্ত ভয়ে পাছে অন্য কেউ সেই রকমই ভোগের লিপ্সায় তার ভোগ্য বস্তু হরণ করে বলে সমাজের নামে নিয়ম, আচার, সূত্রের সৃষ্টি করলো। নারীকে ভোগ্য বস্তু বানিয়ে একান্ত আমার বলে ভোগ করবো বলে তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হয়ে আদিম যুগের মানব সামাজিক নৈতিক সূত্রের সৃষ্টি করেছে। তাই দেখতে পাই প্রাচীন রোমে Patria Potestas এর কর্ত্তৃত্বাধীন হচ্ছে ক্রীতদাস, শিশুরা আর নারীরা—সব বয়সেই আর সব কালে।

আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে দেখতে পাই সেই কথাই ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পুত্রের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন। অপুত্রক ভার্য্যার সংসারে প্রতিষ্ঠা নেই। পতি দেবতা,—নারী চিরদিন তাকে নির্ব্বিচারে সেবা করবে ইত্যাদি অনুশাসনের দ্বারা পুরুষ নারীর মনে নারীর ভোগ্যবস্তুতা সম্বন্ধে এমন একটি সহজ সংস্কার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা আপনাদের সেই অবস্থাকে গৌরবের বস্তু বলে মনে করেন। আজ নারী বলছে যে আমি তোমার ভোগের জিনিষ যদি হই তুমিই বা আমার ভোগের জিনিষ নও কেন? বিদ্রোহের এই সূচনাকে পুরুষ চোখ রাঙ্গিয়ে থামাতে চেষ্টা করলে বটে কিন্তু তার বুদ্ধি তাকে রেহাই দিলো না। সে ঠিক বুঝলো যে এবার নতুন করে আর একবার সম্বন্ধ যাচাই করে নেবার দিন এসেচে।

নারীর দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিন্ন করবার বিরুদ্ধে চল্‌তি যে মত আছে তা এই:—

যৌন সম্বন্ধে যে হেতু নারী সন্তানবতী হয় সেই হেতু তার পক্ষে একাধিক পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন অনুচিত। তা নইলে সন্তানের দায়িত্বভার কোন পুরুষই নেবে না। তা হলে বন্ধ্যা নারীর পক্ষে কি বহু পুরুষানুরক্তি দোষের নয়? দোষের বৈ কি! নারীর পক্ষে একের চেয়ে বেশী পুরুষানুরক্তিই সমাজের চক্ষে দোষনীয় ও দণ্ডনীয়। পুরুষের পক্ষেও যে দোষনীয় এ কথা সমাজ সব জায়গায় বলে নি। পুরুষদের তো আর সন্তান বহন করতে হয় না সেইজন্যে বোধ হয় জীবন-যাত্রায় তাদের এই পৃথক ফল।

এক সময়ে ইন্‌কা'দের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিলো না, সমবায়-সমাজে প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী ইচ্ছানুযায়ী পরস্পরের সঙ্গ লাভ করত। প্লেটো তাঁর রিপাব্‌লিকে তারই কল্পনা করেছিলেন, যদিও সেটা কোন বিশেষ দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রূপে। সেখানে সন্তানদের ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সন্তান নিয়েই যত গণ্ডগোল। তাদের যদি রাষ্ট্র সম্পত্তি করে দেওয়া যায় তাহলে অনেক অশান্তির শেষ হয়।

মানুষের স্বভাবের জটিলতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। আপনার মধ্যে মানুষ অনেক সূক্ষ্ম ভাব-স্তরের আবিষ্কার প্রতিদিনই করে চলেছে। এমন মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হোয়ে উঠেছে যে অন্যের অন্তরের বিচিত্র ক্ষুধাকে সর্ব্ব দিক হতে রসের যোগান দিতে পারে। একজন হয়তো মনে মনে কল্পনা করে যে তার স্বামী গানে, অঙ্কন বিদ্যায়, সৌন্দর্য্যে সর্ব্ব বিষয়েই

তার মনের আকাঙ্ক্ষানুরূপ হবে। বাস্তবে তা সম্ভব হল না। সম্ভব হল না বলে সে কি অন্য কোন পুরুষকে তার গানের জন্যে ভালবাসতে পারে না—অথবা অন্য কোন পুরুষের উপর তার বিশেষ কোন গুণের জন্যে অনুরক্তি আসতে পারে না? এ রকম অনুরাগ যে স্বাভাবিক এবং এর বর্ষণের অভাব যে রস ও রূপ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরস শস্যের অভাব ঘটায় সেটা কি সকলেরই জানা নেই? সুন্দর অভিব্যক্তিকে মানুষ সর্ব্বত্র বরণ করে নেবে, ঘরে তাকে পাই নি বলে বাইরে তাকে পেয়ে স্বীকার করবো না এ দুর্ভাগ্য মানুষের কোন দিনও যেন না হয়।

আর একটা উদাহরণ ধরা যাক্। স্বামী গানে শিল্পে অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর পত্নীর দেহের ক্ষুধা মেটাতে পারেন নি। সে ক্ষেত্রে স্ত্রী দৈহিক তৃপ্তির জন্য অন্য পুরুষ সঙ্গ হয় তো নাও করতে পারেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর মানসিক ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা স্বামীকে দিয়ে কিছু মাত্র মেটে নি সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন, তাহলে সেটা কি যথার্থ ই দোষনীয় বা অস্বাভাবিক?

* * * *

কোন কিছুতেই তৃপ্ত হবার মানে সহজ সংস্কার যেটা আছে যে অতিশয়তার মধ্যেই তৃপ্তি সেটা অত্যন্ত ভুল। যেমন, অনেক গান শুনে তৃপ্তি না হতেও পারে অথচ মনের মত একটি গানে সে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে। সব তৃপ্তি সম্বন্ধেই সেই একই কথা। প্রত্যেকরই এক একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে যার অনুরূপ হলে তবে তৃপ্তি পাওয়া যায়। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে নিজের কাছেও হয়ত সকল সময় নিজের সেই বিশেষ ভঙ্গিটি সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তৃপ্তি যে পেলুম না কিম্বা তৃপ্ত যে হচ্ছি না সেটাও ত অনুভূতি বারে বারে জানিয়ে দেয়।

দৈহিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনের বাইরে এ তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা সমাজে গর্হিত কার্য্য বলে গণ্য। এ যেন বিবাহকে প্রধানত যৌন সম্বন্ধ বলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বীকার করার নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ কি না স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল যে যাকে বিবাহ করবে তার মধ্যে তোমার মনের যোগের সন্ধান তত প্রয়োজনীয় নয় শুধু দেখে নাও যে তার দেহের মধ্যে তোমার দৈহিক ভোগের সব উপচার জোগাড় আছে কি না। এর ফল এই দাঁড়ালো যে সমাজ অজানত মানুষের সেই প্রবৃত্তির উপর ঝোঁক দিলো যেটাকে সে বিবাহের চতুর্সীমানার মধ্যে বদ্ধ রাখতে প্রয়াসী। প্রবৃত্তি কখনো রইল না বিবাহের সীমাবদ্ধ হোয়ে। তার বীজ হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো ঘরে ঘরে তার সংক্রামতা ছড়িয়ে। অথচ দেখ্‌লুম যারা বিবাহকে প্রধানত দেহের সম্বন্ধ বলে স্বীকার করলে না, আপনার রস-উৎসের ধারার সঙ্গে দোসরের নির্ঝর-ধ্বনিকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে ও অনেকটা মিলিয়েও নিলে, তারা যদি কখনও বিবাহের সীমার বাইরে দৈহিক মিলন খোঁজে, তখন দেহের আসক্তির ক্লেদ অন্তহীন কালের মধ্যে ব্যাপ্ত না করে খুব পরিমিত কালের মধ্যেই তাকে নির্ব্বাপিত করে। দেহের আসক্তি নেপথ্যেই থাকে, মনের অনুরাগ নিত্য হয়। দেহকে প্রাধান্য না দিলেও জীবনে তার স্থান যতখানি তা স্বীকার করে নেয়। সমাজ কিন্তু বিবাহ-বন্ধনের বাইরে নর-নারীর মিলন একেবারেই স্বীকার করতে রাজী নয়।

* * * *

নর-নারীর সম্বন্ধের একটা আর্থিক দিক আছে। সেটাকে উপেক্ষা করা চলে না। ব্যর্থ-বিবাহ-বন্ধনে ছিন্ন করার বিরুদ্ধে খুব জোর করে এই কথা বলা হয় যে সন্তানদের পোষণ করবার জন্যে কি ব্যবস্থা হবে? কিন্তু বিবাহিত দম্পতির সন্তানদের পোষণ সম্বন্ধে কি সব ক্ষেত্রেই খুব সুব্যবস্থা হয় দেখতে পাই? অত্যাচারী স্বামী সর্ব্বস্ব মদ ও ব্যভিচারে ব্যয় করছে আর অন্যদিকে

সন্তানেরা অনাহারে মৃতপ্রায়; এ দৃশ্য তো খুব বিরল নয়। সমাজের অনুমোদিত বিবাহ বলে' সমাজ কি কোনরকমে তাদের অন্নের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে? মোটকথা হচ্ছে দায়িত্ব-বোধ। যার অভাবে এই উৎপাত ঘটে, তা সামাজিক শীল-মোহরের ছাপ কখনও এনে দিতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়।

•

প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও অনির্ব্বচনীয় সুষমার একটা আভাস পাওয়া যায়। বন্ধু বন্ধুর রুগ্নশয্যার পাশে বসে অক্লান্ত সেবা করছে; স্ত্রী স্বামীর জন্যে স্বহস্তে রন্ধনে ব্যস্ত—এই ধরণের অতি সামান্য প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে প্রাণের এমন একটি ভঙ্গিমা রূপ নেয়, যা মনকে আলোড়িত করে তোলে। এই যে ছুটি ছবি—এর মধ্যে প্রেমের গভীর জলধারার এমন একটি আবর্ত্তহীন নিরুপম মূর্ত্তি আছে যা মনকে উদ্বেল করে। পরস্পরের নিকট পরস্পরের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তার সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে আদর্শের যে ছায়াপুরী আছে সেইখানে মন ছুটি দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়।

সামাজিক নিয়মসিদ্ধ বিবাহের মধ্যে প্রেমের যে অবমাননা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে, তার ক্লেদসিক্ত বেদনার ভারে মন অবসন্ন হয়। বিবাহের বন্ধনের মধ্যে নিছক্ কামজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে না কি? বীভৎস দৈহিক তৃপ্তি সাধনের ফল স্বরূপ শত শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে না কি? মাতাল লম্পট স্বামীর আলিঙ্গনবদ্ধা স্ত্রীর মানসিক অবস্থা কল্পনা করা কি খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার? অন্যদিকে সমাজের বিধি অনুযায়ী নয়, অথচ বর্ত্তমান কালের ও সুদূর ভবিষ্যতের মানুষের বিরাট সত্তার উপর আস্থা সম্পন্ন ছুটি নরনারীর মিলনের ফলস্বরূপ যে সন্তান—তার জন্য লাঞ্ছনা-ভোগ—কি কারণে ঘটে?

আমি এমন কথা বলছিনা যে বিবাহিত জীবনমাত্রেই কেবলমাত্র কামের বশবর্ত্তীতা ঘটে, আর বিবাহের বাইরে নরনারীর মিলনে তার বিপরীত ছবি দেখি। আমি বলতে চাই, বিবাহ হয়েছে কিম্বা বিবাহ হয়নি তা নয়; ভিতরের কথাটি হচ্ছে, অনুরাগের নিত্যতা রাখতে গেলে যে ধুয়াটি ঘুরে-ফিরে জীবনে আসা দরকার—সেটি আসে কি না? প্রয়োজনের বাইরে কোথায় আমরা মিলেছি—সেই ধুয়াখানি। যেখানে এই সুরের রেশ নেই সেই বিবাহের কদর্য্যতা কি সুস্পষ্ট! আর বিবাহের বাইরে মিলিত নরনারীর জীবনে যদি দেখি প্রয়োজনাতিরিক্ত অনুরাগ, বুঝবো তারা ধন্য হয়েছে, আমাদেরও ধন্য করেছে।

বাইরের ঘটনা কি কখনও অন্তরের পরিমাপ করতে পারে? অন্যায় বিধি মেনে চলার মধ্যে একটা ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে, সময় সময় তার হৃদয়হীনতা সমস্ত চিত্তকে তিক্ত করে তোলে। মাদ্রাজের আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ বিধি বশবর্ত্তী হয়ে অন্ত্যজ প্রাণ নিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু কূপ থেকে এক বিন্দু জল নিতে দিতে রাজী নয়। বিধি হৃদয়ের ধর্ম্মের উপর স্থান পেলে যে অরাজকতা ঘটে—তার দৃষ্টান্ত আমাদের আচারবদ্ধ সমাজে নিত্য দেখতে পাই।

কথা উঠতে পারে যে, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব কি তুমি বাড়িয়ে দিতে চাও? কিসের শাসনে বাঁকা যে সে সোজা হয়ে উঠবে? পঙ্কিলতা স্বচ্ছ রূপ গ্রহণ করবে? আমি বলি যে সত্যই কি বিশ্বাস করো যে সমাজের শাসনে পাপ হ্রাস হয়েছে, পঙ্ক শুধু পঙ্কজকেই জন্ম দিয়ে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে? যদি সত্যই তোমার এ বিশ্বাস থাকে তাহলে আমি বলছি যে, এ ভ্রান্তি মনে পোষণ করো না, পাপ এক তিলও কমেনি,কমে গেছে চিত্তের দৃঢ়তা, যে দৃঢ়তা অন্যায়ের জন্যে আপনাকে সারাজীবনের মত দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হয় না, কমে গেছে সাহস, যে সাহস অন্যায়কে মুহূর্ত্তে সংশোধন করে নেয়। মনে মনে যদি অহরহ চিন্তা করি কেমন করে চুরি করবো, তা হলে চুরি করাটাই কি তার চেয়ে বেশি দোষের হলো? চিন্তাকে তো সামাজিক বিধি বদল করতে পারেনি বরং বাইরের মুক্ত হাওয়ায় তাকে আটক করার ফলে অন্তরের পাতালপুরীর ঘন

অন্ধকারে সে আপনার ইচ্ছামত বীভৎস রূপ ধারণ করেছে।

তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ শুচি থাকবে? আমার মনে হয় জাগ্রত সৌন্দর্য্যবোধ ও সুগভীর ভালবাসা সমস্ত অশুচিতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারবে। জীবনের প্রত্যেক কার্য্য যেন সৌন্দর্য্য-বোধের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়, প্রেমানুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ইহাই সমাজের একমাত্র চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত। সমাজ শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা এই বোধ প্রত্যেক নরনারীর মনে এত সুস্পষ্ট করে দিক্—যাতে মনের সহজগতি সুস্থ হয়ে ওঠে, কোন-কিছু কুৎসিত জীবনে আর স্থান না পায়। এ ব্যতিরেকে আর কোন উপায়ে, কোন বিধির দ্বারা মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়।

ভোগ করবো ভোগের অতীত কোন লক্ষ্য নিয়ে। ত্যাগ করবো কেবলমাত্র ত্যাগকে একান্ত জেনে নয়, ত্যাগের দিক্-চক্রবালের পশ্চাতে উষার নব অরুণোদয়কে মনে রেখে। এ যদি না সম্ভব হয় তাহলে ভোগই বলো আর ত্যাগই বলো সবই কলুষিত হয়ে ওঠে।

খাঁচার জীবন একটানা—

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

বড়দা হা হা করিয়া হাসে। দাঁতের পাটি ভেদ করিয়া জিবটা একটু বাহির হয়। কস্ দিয়া পানের রস গড়াইয়া পড়ে। পেটের ভুঁদিতে হাত বুলায়।

বলে, এই নিয়ে বেঁ—বেঁচে আছি। বুইলে অ—অসিক?—আবার হাসে।

তাহার সে হাসি দেখিলে রাগ হয়। বলি, এই জন্যেই বো'য়ের সঙ্গে বুঝি খিটিমিটি বাধে?

সে বলে, আমার চেয়ে তাকে উ—উই চিনিস?—বেশ—বে—বেশ।—বলিয়াই হাসে।

বড়দা গাঁজা খায়—একটানে এক কল্কে। এক বোতল মদে থই পায়না। আফিম রোজ আধ-ভরি। হাটে তার জন্যই সিদ্ধির ব্যবসা চলে।

বউ বলে, মরণ দশা!—শূয়োরের ইয়ে খাওয়া—

বড়দা হাত নাড়িয়া মাথা দুলাইয়া গান ধরে। জিব বাহির করিয়া আবার হাসে।

বউ বলে, মলেই বাঁচি।—বলিয়া রাগে পিছন ফিরিয়া বসে। তারপর আড়চোখে আমার দিকে চায়। একটু হাসে, বলে, আমি বলেই আছি, নৈলে—বলিয়া আঁচল দুলাইয়া চলিয়া যায়।

বড়দা আমাদের চোখে-চোখে রাখে; বলে, ক—কদম বুঝি তোদে' এক গাঁয়ের মে—মেয়ে? তাই ভাব্?

আমি তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলি, হুঁ—সে অনেকদিনকার—ছোট্টবেলা থেকে……

—ওঃ তা—তাইতেই। বলিয়া একটু হাসিয়া বড়দা আবার সিদ্ধির গেলাসে চুমুক মারে।

আবার বলে, তোর নাম অ—সিক,—কই—অসিকতা—ক—করিস্‌নে?

তাহার হাসি দেখিলে আমার রসিকতা আসে না।

বউ বলে, মুখ দেখলে ঘেন্না করে—হাসি আসে না ছাই—। বলিয়া চোখ টিপিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া আমায় বলে, উঠে যাও—পাগল!

বড়দা বলে, ন্—ন্—না—না—কক্ষণো যাবে না—

আমরা উ—উজনে হিরোকেলে ইয়ার—এক জনের ভাত আমরা উজনে হে—হেয়ে মান্থষ—

বউ আমার দিকে চাহিয়া আবার হাসে।

তার বড় বড় চোখ-দুইটা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাই।

বড়দা উঠিয়া যায়। খপ্ করিয়া তাহার হাত গিয়া ধরে। বলে, কা—কাতু কুতু দো'ব ?

সে বলে, ছাড়ো ছাড়ো—ও কি ভাববে?—হাত নয়তো ছড়কো—বলিয়া চলিয়া যায়।

বড়দা আমার দিকে ফিরিয়া বলে, দেখলে ত?—আমার দোষ নে—নেই—। আদর কর্ত্তে গে গেলুম হিঁলে না—বলিয়া গামছাখানা কাঁধে লইয়া চলিয়া যায়।

আমার গা শির্ শির্ করিয়া ওঠে।

বউ ফিরিয়া আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, রোজ রোজ রাঁধতে আর পারি না—

—সংসারে অরুচি—না?—আমি বলি।

সে আপন-মনে হঠাৎ হাসিয়া বলে, সবতাতেই—সংসার না ছাই—দিন-কাটানো—মরণ হলেই বাঁচি—। বলিয়াই হাসে। আবার বলে, কদম নামটা বিচ্ছিরি, না? মানায় না, বিধুমুখী হ'লে কেমন হত?

আমি হাসি, হাসিয়া বলি, তাতে আমার কি?

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলে, তা বটে!—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়।

দুপুর-বেলায় ঘূর্ণী-বাতাসে মনের ভিতর উস্‌খুস্ করিয়া ওঠে। মন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। তাই রোজই যাই। আজও গেলাম।

বউ পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিল। তাহার গল্প শুনিতে বেশ লাগে। হঠাৎ সে বলিল, পায়ের দিকে চেয়ে আছ কেন? বলিয়া হাসিয়া আবার বলিল, আর আল্‌তা পরা হয় না—।

বলিলাম, নাই বা হল?

সে বলিল, এমনিই দেখতে ভাল—কেমন? বলিয়া মাথার ঘোমটা একটু খুলিয়া চুল কুলাইতে কুলাইতে পুনরায় বলিল, আরও সুন্দর হলে কেমন হত বল দেখি?

চুপ করিয়া রহিলাম।

সে আবার বলিল, শান্ত হলে কবে থেকে? এমন ত ছিলে না—লজ্জা হচ্ছে বুঝি? আসছি। বলিয়া সে কাপড় সামলাইয়া উঠিয়া গেল।

মিনিট্-পাঁচেক বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মুখে রোদ পড়েছে যে? সরে' বসো!

সরিয়া বসিলাম। সে আবার বলিল, কী লোক বাপু তুমি—এম্‌নি অযত্ন করেই ত' চেহারায় কালি পড়ে গেছে……

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মুখ নীচু করিল। হাসিয়া বলিলাম, ভাগ্যিস্ বললে?

সে একবার এদিক-ওদিক চাহিল। তারপর আস্তে আস্তে অথচ স্পষ্ট করিয়া বলিল, বিশ্বাস হল না বুঝি?—আমি না-হলে বলবে কে?—সেই এতটুকু বেলা থেকে—মনে নেই?

বাধা দিয়া বলিলাম, থাক্। বার-বার সে কথা মনে করিয়ে দিতে হবে না—। বড়দা কই?

—কাল থেকেই ত বাড়ী নেই—।

বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, কেন?

—কেন জান না?—দেখ-গে কোন্ নর্দ্দমায় পড়ে আছে।—পোড়া কপাল! মেয়ে-মান্থষ তাই এমন হয়ে আছি……

বলিলাম, হুঁ—

—'হুঁ' কি—স্পষ্ট করে' বল। 'হুঁ' দিয়ে সব সারতে পাবে না—।

হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, কি বলব বৌদি?

হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া সে বলিল, বৌদি, বৌদি—কেবলই বৌদি। বৌদি ডাক শুনতে আমার ভাল লাগে

না। না হয় কদমই ব'লো—বলিয়া হুম্ হুম্ করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার এ রাগ আমার ভারী ভাল লাগিল।

খানিক বাদে আবার সে ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, জল দিয়া মুখখানি ধুইয়া মুছিয়া আসিয়াছে। এবার হাসিয়া বলিল, রাগ কল্লে?

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, ব'য়ে গেছে—

সে বলিল, আচ্ছা, কালা-পেড়ে শাড়ী কিনতে পাওয়া যায় না? বেশ চওড়া পাড়—

বলিলাম, খুব যায়—দাও না, এনে দিচ্ছি।

—কি?—দাম?—নয় তুমিই দিলে?

হাসিলাম।

সে বুঝিল। বলিল, ও সে-মানুষ নয় যে যত্ন-আত্তি করবে। এত লোকের কাছে টাকা ধারে যে তারা রোজ গালাগাল দিয়ে যায়—

বলিলাম, সেই ত কাবলিঅলা, আর কে?

—ওঃ সে অনেক! চণ্ডী মুচি, নটু পোদ্দার, যাদব সাঁপুই—সব আগুন হয়ে আছে। বলে, দেখলেই বেউ-জ্জত করব—বলিয়াই হাসিতে হাসিতে সে পুনরায় বলিল, আমার তাতে দুঃখু নেই।

কথাটা ঠিক ধরিতে পারিলাম না। বলিলাম, তার মানে?

সব জিনিষের মানে হয় কি? বলিয়াই সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসি ভাল লাগিল না। রাগিয়া বলিলাম, তবে বড়দাকে তুমি অত ভক্তি কর কেন?

সেটা আর এমন-কি আশ্চয্যি?—সে বলিল।—তোমাকেও ত করি, তুমিও যে আমার বয়েসে বড়। কত বড় বলব? বলিয়া সে আঙুল গুণিতে গুণিতে বলিল, তোমার বয়েস যখন ষোল, আমার তখন ঠি—ক বার। কেমন, নয়?—আচ্ছা, ভগবান বড় এঁক-চথো,—না?

এ—এ—এক চোখো, না—না—কদম? বলিতে বলিতে বড়দা উল্কার মত আসিয়া হাজির!

তাহার মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল। আমিও কাঠ হইয়া গেলাম।

বড়দা কিন্তু সে ধার দিয়াও যায় নাই। হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, কি চাই ব্—বল্না এনে দিচ্ছি। আ—আগ্ করিস্ কেন? ও-ওরে ওই! বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার গাল টিপিয়া বলিল, তু—তু—তুল্‌তুলে, ন্—নরম হাতে লাগে অ—অসিক, মনে লা—লাগেনা। বলি, ম্—ম্-মহাদেব হয়েছে?

জানিনি যাও! বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধির আর-এক নাম মহাদেব।

আমার দিকে ফিরিয়া বড়দা বলিল, ও খুব ভ্—ভাল না অ—অসিক?—দেখতেও ভাল ন্—ন্—নারে? বলিয়া মুদ্রাদোষ অনুযায়ী একটুখানি জিব বাহির করিয়া বড়দা হাসিতে লাগিল।

আড়াল হইতে শুনিলাম, বড়দা বলিতেছে, ভ্—ভ্—ভারী রূপ—! কী ছ্—ছাই দেখাতে যাস্? ছ্—ছেলে অ্যালা থেকে হাব, ত্—তা এখন কি? আমি ব্—বুঝি কেউ ন্—নই?

বউ বলিল, কেন, কথা কইলে কি হয়?—কি বলিছি?

—না, ত্—তুই কথা ক্—ক্—কস্‌নি। আমার বুঝি আ—আ—আগ হয় না? ত—তুই ত আমার বউ, ন্—না আর কারো? ও—তো আমায় ব—ব—বড়দা বলে—

—যাও, তুমি গর্ গর্ করোনা—যা নয় তাই বল! আমার জ্ঞান নেই? বলিয়া বউ কাপড় গুছাইতে লাগিল।

বড়দা বলিল, ত্—তোরও গ্-গ্—অ্যান্, না ক্—ক্—কদম?—হি—হি···

বড়দা হাসিতে লাগিল।

—ওখানে কেরে,-অ—অসিক না কি?

চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, হ্যাঁ।

বউ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, রোদে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসোনা গো রসিক বাবু—ঝগড়া শুনছিলে বুঝি?

বড়দা আসিয়া একেবারে আমার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, ও—ওকে যে ওর ক্—কথায় তুই ভেতরে আসবি? আ—আমি বলছি তুই আয়। ত্—তুই ত আমার ব্—বন্ধু। বলিয়া টানিয়া আমায় ভিতরে লইয়া গেল।

বউ রাগিয়া বলিল, অমন হিংসের মুখে নুড়ো জেলে দি'—বলিয়া আড়চোখে আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, তা—আমার জোর ত নেই⋯ ⋯

বড়দা বলিল, ক্—কেমন ক্—হদমকে অপমান কল্লুম —দেখলি ত? বলিয়া হ্যা হ্যা করিয়া বিকট স্বরে হাসিয়া উঠিল।

আমি ইহাদের দিকে চাহিয়া বলিলাম, ঝগড়া কিসের?

বউ বলিল, ওই জিজ্ঞেস্ কর,—আমার নাকি রূপ নেই,—

বড়দা তাহার ছোপ্-পড়া নোংরা দাঁত বাহির করিয়া স্ত্রীর হাসির অনুকরণ করিয়া বলিল, ন্—ন্—নেই ত—তবে বে—হেঁড়া-কাপড় পরলে স্—সব মেয়ে-মানুষকেই ভ্—ভাল দেখতে হয়—না অ্—অসিক?

—মুখে আগুন কথার!—বলিয়া লজ্জায় মুখ লাল করিয়া বউ চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, ছি—ছি তোমার কি জ্ঞান নেই?

সে তেমনি করিয়া নির্লজ্জ হাসি হাসিতে লাগিল। যেন অনেকখানি রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছে। যাইবার সময় বলিল, ক্—কদম দেখতে নেহাৎ ম্—ম্—ওঁন্দ নয়, নারে?

সে চলিয়া যাইতেই বউ দরজার পাশ হইতে বাহির হইয়া বলিল, কই কথার উত্তর দিলে না—?

বলিলাম, কি?

—দেখতে বুঝি ভাল নই?—সে বলিল।

—কে বললে?

—তবে চুপ করে আছ কেন? বলিয়া হেঁট হইয়া নিজের আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, দেখতে ত ভাল নই, তা আমিও জানি—। বলিয়া মধুর হাসি হাসিয়া পুনরায় বলিল, কই কালাপেড়ে শাড়ী আনলে না, রসিক-বাবু?

আজও তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমার ভরসা হইল না। মনে হইল, হয়ত অন্য-কিছু দেখিতে পাইব, কিন্তু সেটা যে কি—তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

হঠাৎ মুখ তুলিতেই দেখি, তাহার উজ্জ্বল চোখ দুইটা আমার পানে স্থির নিবদ্ধ, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে সরিয়া গিয়া বলিলাম, কি বলচ তুমি?

—কিছু না। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার একটা হাত ধরিতে গেলাম, পারিলাম না, কিন্তু হঠাৎ—আমার সুমুখে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—চোখ চাহিয়াও যেন অন্ধকার! আস্তে আস্তে ভিতরের দরজার দিকে সরিয়া গেলাম। সে তখন চলিয়া গেছে।

ফিরিয়া আসিলাম। দুয়ারে দাঁড়াইয়া কি করিব ভাবিতেছি—সে আবার আসিয়া বলিল, চল্‌লে না কি?

মুখ ফিরাইলাম। বলিলাম, কি কর্ত্তে থাকব?

—তা সত্যি⋯ বলিয়া সে সরিয়া আসিয়া পুনরায় বলিল, শোন, তুমি আমার সঙ্গে আর কথা বলো না—উনি বড় বকেন।

আবার বলিল, তুমি ওঁর সঙ্গে মিশে দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছ, এখানে আর এসোনা তুমি—। বলিয়া সে দ্রুত-পদে চলিয়া গেল।

আমি বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম, কত রকমই দেখব। বলিয়া চলিয়া গেলাম। খানিক দূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম, সে জান্‌লার ধারে আমার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দুপুর-বেলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ওখানে আর যাই না।

রাতের বেলা শুক্‌নো পুকুরের পাড়ে বসিয়া থাকি। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় কিছু দেখা যায় না। সুমুখে দেবদারু গাছটার ঝোপে চিক্‌মিক্ করিয়া জোনাক্-পোকা জলে।

অন্ধকারে হাৎড়াইয়া অর্দ্ধেক রাস্তা যাই। বউকে দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আবার ফিরিয়া আসি।

সে-দিনকার সে-কথা ভাবিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

সেদিন জনার্দ্দন বলিল, শুনেছ ছোটবাবু, পাগ্‌লা ঠাকুর কি রকম বেধড়ক্ মারটা খেলে?

বলিলাম, সে কি! কবে?

—ওই ত শেতলাতলায়, কাল ভরসন্ধ্যে বেলা। মিনি-মাগনায় কি নেশা হয় ঠাকুর?—দেনা করে পালিয়ে বেড়ানো কেন বাপু, চুকিয়ে দিলেই ত হয়। কিন্তু আশ্চয্যি ছোটবাবু, মার খেয়েও পাগলা-ঠাকুরের মুখে হাসি মিলোয়নি—

—তাই না কি?

—সত্যি—

কি একটা কাজে সেদিন ওই রাস্তা দিয়া ফিরিতে-ছিলাম। মনের ভিতরকার দাগটুকু ক-দিনে প্রায় মুছিয়া আসিতে ছিল। কানে একটা শব্দ আসিল, শোন—

ফিরিয়া দেখিলাম, বউ ইসারায় ডাকিতেছে। সরিয়া গিয়া বলিলাম, কি?

—কোথায় গিছলে?

—ওই বারোয়ারী-তলায়—কেত্তন শুন্‌তে।

সে কি ভাবিয়া বলিল, রাগ করেছ?

একটু হাসিলাম, কিন্তু নিজের হাসিতে বিরক্ত হইলাম; বলিলাম, নাঃ—

—চেহারা খারাপ হয়ে গেছে কেন?

তাহার এ মুরুব্বিয়ানা আমার ভাল লাগিল না। বলিলাম, সব কথার উত্তর দেওয়া যায় না।

—আচ্ছা যাও।

সন্ধ্যা হয় নাই। দিনান্তের আলো তখনও অবশিষ্ট আছে। সে আলোকে দেখিলাম, তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে অশ্রুকে বিশ্বাস করিতে আজ আমার প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলাম, চলিয়া যাই। এ মিথ্যা অভিনয়কে প্রশ্রয় দিয়া আর নিজেকে ঠকাইব না। অথচ যাইতেও পারিলাম না, বলিলাম, কাঁদ্‌চো—?

সে তাড়াতাড়ি জান্‌লা হইতে সরিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম, আবার শব্দ আসিল, একটা কথা শুনবে?

মুখ তুলিলাম। সে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, কোথাও নিয়ে যেতে পারো আমায়?

গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লক্ষ্য করিলাম,—তাহার চোখের দুইটি ধারা গালের উপর গড়াইয়া আসিয়াছে।

বলিলাম, কোথায় যাবে?

—চুলোয়। বল, নিয়ে যাবে কি না? এখানে আর থাক্‌তে পারি না, সত্যি আর থাক্‌তে পারি না—পাগল হয়ে যাব। বলিতে বলিতে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কি জানি কেমন হইয়া গেলাম। জান্‌লায় একটা পা রাখিয়া উপরে উঠিয়া তাহার হাতটা বোধহয় ধরিয়াও ফেলিয়াছিলাম,—হঠাৎ বড়দার চীৎকার শুনিয়া লাফাইয়া পড়িলাম এবং কোনও কথা ভাবিবার পূর্ব্বেই মুখ লুকাইয়া পলাইয়া গেলাম।

বড়দা চীৎকার করিয়া উঠিল, ঐ—ঐ—চ—চ—চ —চোর—চোর—ঐ প—পালাচ্ছে—ধর্—ধ—হর্—! বলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে আন্দাজে চোরের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। লোকজনও হয়ত জড়ো হইয়াছিল।

......কিন্তু আমি তখন ঘরে বসিয়া ইতর জন্তুর মত হাঁপাইতেছি।

তিনদিন ঘরের বাহির হই নাই। হঠাৎ সেদিন সবিস্ময়ে দেখিলাম, তাহাদের সে বাড়ীখানায় কেউ নাই। দুজনেই কোথায় চলিয়া গেছে।

বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল।

পরিত্যক্ত শূন্যপুরীর আবর্জ্জনার দিকে চাহিয়া কি জানি কেন আমার চক্ষে জল আসিল।

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয় নাই।

জনার্দ্দন একদিন যাচিয়া বলিয়াছিল, পাগলা-ঠাকুর নাম সাত্থক হলো ছোটবাবু,- চোরের ভয়ে দেশছাড়া—

ওই বাড়ীর আকর্ষণ রোজ আমায় টানে। পথের ধারে দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়া লই।

মনে হয় বাড়ীখানার জীর্ণ ভিতের তলায় নিপীড়িত মানবাত্মার অশ্রু জমিয়া আছে।

কখনও দেখি,—একটা কাবুলিওয়ালা বাড়ীখানার সুমুখে দাঁড়াইয়া ঠোঁট কামড়ায়। হাতের ঘুষি পাকায়।

চয়নিকা

বৈকালী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হ'তে
আমারে দিলো ছুটি।
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি',
সুদূর বন-গন্ধ আসি'
করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপি চুপি কী করুণ কথা
কহিল সারা গায়ে।
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি,
বুকের কাছে সবাই এলো ছুটি'॥

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
যা-কিছু মোর ভাবনা ছিলো
সকলি নিলো লুটি'।
ডাকিয়া মোরে আনিল লীলাভরে
সকল-ভোলা দুয়ার-খোলা
পুরানো খেলা-ঘরে,—
যেখানে ছিনু সবার কাছাকাছি,
অজানা ভাবে অবুঝ গান
যেখানে গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে বানের মতো
ক্ষ্যাপামি এল ছুটি'।
কাজের বাঁধ সকলি গেল টুটি'॥

চপল তব নবীন আঁখি দুটি,—
সে আঁখি-পাতে আকাশ উঠে

ফুলের মতো ফুটি'।
ইসারা তার চমক দেয় চিতে,
অশোক-বন বাজিয়া উঠে
রঙীন রাগিনীতে।
অলস হাওয়া আধেক জেগে জেগে
গগনপটে কী ছেলেখেলা
খেলায় মেঘে মেঘে।
কমল-কলি বুলায় বুকে
কোমল কচি মুটি,
পরাণে মনে নিখিলে জেগে উঠি'॥

—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩

ধর্ম্ম ও জড়তা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ প্রভাত কার ঘরে তিমির-দ্বার খুলে গিয়েছে? যে চোখ খুলে আছে। সব চেয়ে দুঃখ তার, যে আলোকের মধ্যে থেকেও চোখ বুজে আছে; যার চারিদিকে আঁধার নেই; যে আপন আঁধার আপনি সৃষ্টি ক'রে ব'সে আছে।

আজ পশ্চিমদেশ য়ুরোপ নানাজ্ঞান নানাবিধ কর্ম্ম-শক্তিতে নব-নব বলে চোখ খুলে এগিয়ে চলেছে, তার নিত্য নব-জাগরণ চলেছে। ভারত যে তার চোখ খুল্‌তেই চাচ্ছে না। আপন চোখ বুজে মিথ্যা অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে ব'সে ভাব্‌চে, সে এমনি ক'রে তার আধ্যাত্মিক স্বর্গ পাবে।

য়ুরোপের পন্থা হ'ল জ্ঞানবিজ্ঞান; সেই পথটি সত্য ও বিশুদ্ধ রাখবার জন্ম কত যত্নে, কত ধীরে, কত সাবধানে যুক্তি ও বিচার পরখ ক'রে ক'রে সে তার তত্ত্ব নির্ণয় করচে।

আমরা নাকি ধর্ম্ম প্রাণ জাতি! তার পরিচয় হ'ল কেমন ধারা? আজ ভারত তার ধর্ম্মের পন্থাকে পবিত্র রাখ্‌তে পারেনি ব'লে তার সব চেয়ে কঠিন সমস্যা তার ধর্ম্মে। যা-কিছু ঘাড়ের উপর এসে পড়্‌চে তাই নির্ব্বিচারে ধর্ম্মের নামে মেনে নেওয়ার নাম উদারতা নয়, তা হ'ল ভয়ঙ্কর অন্ধতা, জড়তা। এই জড়তাকে যখন কোনো জাতি উদারতা মনে ক'রে পূজা করে তখন তার মরণ আসন্ন। ধর্ম্মের যথার্থ সত্য স্বরূপটিও অতি সাবধানে বৈজ্ঞানিকের সত্যের মত নানাদিক্‌ থেকে যাচিয়ে পরখ ক'রে নিতে হয়। ধর্ম্ম যদি কোনো জাতির প্রাণ হয়, তবে সেই জাতির এই বিষয়ে যেন সাবধানতার ও শুচিতার শেষ না থাকে, কারণ একটু অন্ধ হ'লেই তার মৃত্যু এই দিক্‌ থেকেই আস্‌বে। যদি এ বিষয়ে একটুও জড়তা থাকে, তবে যত মিথ্যা সংস্কার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-বুদ্ধি, নিরর্থক-আচার, অন্ধ আবর্জ্জনা এসে ধর্ম্মের সিংহাসনকে অধিকার ক'রে ধর্ম্মকে চেপে মেরে ফেলে।

ভারতের আজ এই দশা। সে আজ ভাল-মন্দ মহৎ-ক্ষুদ্র সবাই এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে মেনে নিচ্চে। ভারতের সমস্যা এইখানে; এই দিক্‌ থেকেই তার মৃত্যুর আয়োজন চলেছে। তাইতে আজ দেখ্‌চি ধর্ম্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্ম্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারচে। এই কি হ'ল ধর্ম্মের চেহারা! এই আধ্যাত্মিকতা দিয়েই ভারত সব বিজ্ঞানবাদের উপর মাথা তুলে অমৃততত্ত্ব লাভ করবে?

একে অন্যকে মারচে, এই কথাটিই সব চেয়ে দুঃখের কথা নয়—যদি এই মারাটা জীবনের প্রাচুর্য্য, জীবনের চঞ্চলতা থেকে হ'ত। যেখানে জীবনের প্রাচুর্য্য-শক্তির অজস্র লীলা, সেখানে চঞ্চলতা দৌড়ধাপ মারামারি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে সব ঠিক্‌ হ'য়ে আসে। শিশুর জীবন লীলার প্রাচুর্য্যে সে ওঠে পড়ে ভাঙে, আঘাত পায় ও আঘাত দেয়; তাতেই ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসে। কিন্তু এ তো তা নয়, এ যে নির্জ্জীবের হঠাৎ প্রচণ্ড হ'য়ে নির্ম্মম হ'য়ে ওঠা। অচল পাথর যেমন হঠাৎ স্খলিত হ'য়ে সর্ব্বনাশ করে। সেই বুদ্ধিহীন জড়ধর্ম্মী নৃশংসতাকে দৈব-পূজার উপলক্ষ্যে ধর্ম্মের নামে পরিচিত ক'রে আপনাকে

ও বিশ্বশুদ্ধ সকলকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। এর কি কোনো কৈফিয়ৎ থাকতে পারে?

এই মোহমুগ্ধ ধর্ম্ম-বিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভাল। ঈশ্বর-দ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্ম্মের নামাবলী পরালে যে কি বীভৎস হ'য়ে ওঠে, তা' চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়। এর চেয়ে ভীষণ, এর চেয়ে কলুষিত আর কি হ'তে পারে?

সত্যের সঙ্গে মিথ্যা এসে জুটেছে। খাঁটির সঙ্গে কলঙ্ক মিশে গেছে। য়ুরোপ তার জ্ঞান-সাধনার পথে কোনো মিথ্যাকেই সহ্য করতে পারে না, তাকে পরখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। তাই তারা বেঁচে আছে। বিজ্ঞানের আহ্বান তাদের কাছে সত্য আহ্বান, তাই তাদের সাধনাও কঠিন সাধনা। পরখের পর পরখ চলছে, বারবার হারতে হচ্ছে—তবু হার মানচে না। পরাস্ত হ'লেও সাধনা ছাড়চে না; চেষ্টার পর চেষ্টার সাধনার বলে বিজ্ঞানের রাজ্যে খাঁটি সত্যকে বাজিয়ে নিচ্চে। সত্যের সাক্ষাৎ লাভ ক'রে সাধনাকে ধন্য করবে। আর আমাদের ধর্ম্ম নাকি প্রাণ! সেই ধর্ম্মের সাধনায় আমাদের কতটুকু নিষ্ঠা! জড়তার আর অন্ত নেই। যত ধুলো, যত আবর্জ্জনা, সবই আমরা মাথা পেতে নিয়ে পূজা করতে ব'সে গিয়েছি। এই কি বাঁচবার সাধনা? এতে যদি কোনো জাতি বাঁচে, তবে জাতি মরে কিসে তা তো বলতে পারি নে।

খাঁটির সঙ্গে নকল যদি মেশে, তবে আগুনে পুড়িয়ে সব কলঙ্ক দূর করতে হয়। আজ তার এই মিছে ধর্ম্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি একবার সত্যিই নাস্তিক হয়, তারপর সাধনা ক'রে যদি খাঁটি ধর্ম্ম, খাঁটি আস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যিই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্ম্মবিকারকে দগ্ধ করা ছাড়া, একেবারে নূতন ক'রে আরম্ভ করা ছাড়া, আর কি পথ আছে, বুঝতে তো পাচ্ছি নে। সব আবর্জ্জনা, সব মিথ্যা, সব জঞ্জালকে পুড়িয়ে ফেলে সত্য জীবন ভালো ক'রে গেলেই মঙ্গল। ভয় নেই, সত্য দগ্ধ হবে না, খাদই পুড়ে যাবে। সব মিথ্যা আবর্জ্জনার রাশি দগ্ধ হ'য়ে গেলে, প্রাণের বিকাশের পথ খুলে যাবে।

আসলে, মোহই হচ্চে সকল রিপুর কেন্দ্রস্থল ও তা অজ্ঞানের আবেশ, তা জড়তা, তা আলস্য, তা অবসাদ; তা কুৎসিতকে অপসারিত করতে জানে না; তা মৃত্যুকে রাশিকৃত ক'রে তোলে, কলুষ-সঞ্চয়ের প্রতি তার অন্ধ আসক্তি! এই মোহের ভারে যতদিন মাথা নত হ'য়ে থাকবে, ততদিন সত্যের সাক্ষাৎ মিলবে না—আর সত্যের অভাবে বীর্য্য হবে গোঁয়ার্ত্তামি, ধর্ম্ম হবে সাম্প্রদায়িক দাম্ভিকতা।

রুদ্র এসে মোহের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিন। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ও দুঃখের মধ্যে মোহের ক্ষয় হ'তে থাকুক। আজ দয়াময়কে নয়, আজ রুদ্রকে চাই—তাঁর প্রলয় আগুনে সব দগ্ধ হ'য়ে বিশুদ্ধ হ'য়ে যাক্। তাঁর কাছেই প্রার্থনা আমাদের 'অসতো মা সদ্গময়।'

—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রী শান্তা দেবী

খুব অল্প বয়সে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত একখণ্ড রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী হাতে পাইয়াছিলাম। তাহাতে গদ্য পদ্য গল্প প্রবন্ধ সবই একসঙ্গে পাওয়া যাইত। কিন্তু তখনকার বয়সে কাব্য মনকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিত না। সুতরাং তাহা কোনদিন পড়িয়া দেখি নাই। সকলের আগে মন যাইত 'ইউরোপ-প্রবাসী'র পত্রের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একসঙ্গে বাক্সের উপর "নির্দ্দয়ভাবে নৃত্য" করিয়া কি করিয়া যে তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন এবং ভুল করিয়া অপরের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়া কি রকম গোলমাল' বাধাইয়াছিলেন এই সকল বর্ণনাই ছিল আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু তারপর অল্পে অল্পে গল্পগুচ্ছের দিকে মন ঝুঁকিতে লাগিল। তখন কেবলমাত্র নিছক হাস্যরস ছাড়া অন্য রস সন্ধানও মন করিত। সে ছিল বিস্ময়রস। কোন্ কোন্ গল্প তখন পড়িয়াছি মনে নাই, কিন্তু এই বিস্ময়রসকে যে সকল ছবি জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং আপন মনে নব নব ছবি গড়িয়া তুলিতে ও অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল সেই খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি নানাগল্পের কাঠামো হইতে সরিয়া আসিয়া আজও একটি স্বতন্ত্র চিত্র-শালার মত মনের একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বিস্ময়কর ছবিগুলি শুধু যে বিস্ময় জাগাইত তাহা নহে, ভীতিও জাগাইত। ভৌতিক বিস্ময়ের ভীতি মনকে যতই কাঁপাইয়া তুলিত, ততই সেই রহস্যময় অন্ধকার রাজ্যের ভিতর উঁকি ঝুঁকি দেওয়া বাড়িয়া চলিত, ছবি-গুলি মনে আরো শিকড় গাড়িয়া বসিত।

মনে পড়ে 'জীবিত না মৃতে'র কাদম্বিনীর সেই প্রথম ছবি। বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-রাত্রির গভীর অন্ধকারে শ্মশানের কোলে জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল সে ত আপনার গৃহে নাই। মৃত্যুশয্যার কথা মনে করিয়া সে বুঝিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে অথচ সে দেখিতেছে যে সে বাঁচিয়াই আছে। কাদম্বিনীর মনের এই দ্বন্দ্ব আমার শিশু মনকে মহা সমস্যায় ফেলিয়াছিল। মৃত্যু যে কি জিনিষ, মরিয়া মানুষ কেমন করিয়া আপনার মৃত্যুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না; তাই কাদম্বিনীর মত আমারও মন সংশয় দোলায় দুলিত। অবশেষে মরিয়া কাদম্বিনী প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই। বাহিরের লোক বুঝিল বটে যে কাদম্বিনী প্রথমবার মরে নাই; কিন্তু কাদম্বিনী নিজে কি করিয়া বুঝিল সেইটা আমার কাছে রহিয়া গেল এক পরম সমস্যা।

'নিশীথে'র সেই পদ্মার চর-জোড়া হাসি, যাহা পদ্মা-পার হইয়া দেশদেশান্তর লোক লোকান্তর ছাড়াইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াও মস্তিষ্কের সীমানা ছাড়াইয়া যায় না—মৃতের পরিহাসের মতই কানে বাজিত। মনে হইত যেন শুনিতে পাইতেছি। মাথার উপর দিয়া হাসির তীব্র সুর ভাসিয়া যাইতেছে, যেন অন্ধকারে শীর্ণ অঙ্গুলি বাড়াইয়া "ওকে, ওকে, ও কে গো?" বলিয়া দক্ষিণা-রঞ্জনের মশারির চারিধারে কে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। মৃতা-ত্মার এই নির্মমতায় বেচারী দক্ষিণার প্রতি বড় করুণা হইত।

'মণিহারা' ফণি-ভূষণের ঘরে বর্ষার অন্ধকারে রাতের পর রাত নদীর ঘাট হইতে সুরু করিয়া দেউড়ি পার হইয়া অন্তঃপুরের গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া সর্ব্বাঙ্গে হীরা ও স্বর্ণের অলঙ্কার পরিয়া হাড়ে হাড়ে গহনার খট্ খট্ ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার তুলিয়া যে কঙ্কাল উঠিত, তাহার সমগ্র ইতিহাসটাই যে মিথ্যা প্রমাণ করা হইল কেন বুঝিতাম না। ফণি-ভূষণের স্ত্রীর নাম নৃত্যকালী ছিল, এক কথায় ইহা বলিয়া মন হইতে মণিমালিকার সালঙ্কারা কঙ্কাল মূর্ত্তিকে মুছিয়া ফেলা ত গেল না। কঙ্কালের সেই অবাস্তব ভীতিবিস্ময়কর কাহিনীই সত্য হইয়া বলিত নৃত্যকালী একটা পরিহাস মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নানা রস নানা রূপ ও নানা ভঙ্গী দেখা দিয়াছে। মানুষের মনের বহু বিচিত্র গতিকে বহু চিন্তা সমস্যা দুঃখ সুখ হাসি কান্না ও ছোট বড় অনু-ভূতির নানা স্তরকে তিনি তাঁহার লেখনীর সতেজ কোমল, দৃঢ় ও পেলব স্পর্শে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই স্পর্শের ছন্দ ভঙ্গী ও দৃঢ়তা অনুসারে বিষয়ের বৈচিত্র্য হিসাবে রসের ও রঙের তারতম্য অনুসারে নানা দিক দিয়া দেখিলে গল্পগুলিকে নানা শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু এতগুলি শ্রেণী বিভাগ করিয়া এত রকমে তাহাদের রূপ ও রসের বিশ্লেষণ করা ক্ষুদ্র শক্তি, স্বল্পকাল ও অল্প স্থানের পক্ষে সম্ভব নহে। এখানে আমরা কেবল বিস্ময়রসের কথাই দুই একটা আলোচনা করিব।

জীবনে মানুষ আপনাকে ধন জন যৌবন হিংসা প্রেম মান মর্য্যাদা নানা জালে জড়ায়। এই পার্থিব জটিল জালই তাহার কাছে শাশ্বত হইয়া উঠে। অথচ সে জানে যে একদিন এই জাল ছিন্ন করিয়া সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া অথবা পিছনে ফেলিয়া তাহাকে অকস্মাৎ বিদায় লইতে

হইবে। ইহা হইতে মানুষের মনে একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। সমস্ত জীবন দিয়া মানুষ তিল তিল করিয়া যাহা গড়িল, যাহা বেষ্টন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াই প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বাঁচিল, তাহার ভিতর হইতে সে কোথায় যায়? যদি যায় তবে কি অতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার সৃষ্ট এই সংসারের চারিধারেই ঘুরিয়া বেড়ায় না, ইহাকেই ফিরিয়া পাইতে চায় না? অজানা-লোকে কেমন করিয়া সে শান্তি পায়? অথবা শেষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষে তাহার সমগ্র সত্তা মিলাইয়া যায়?

জীবিত মানুষের অনন্তকাল এই দেহে কি পর দেহে বাঁচিয়া থাকিবার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহারই সহিত আপনার ও পরের মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহল ও বিস্ময় মিলিয়া যে ভৌতিক বিস্ময়রসের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষ চিরকাল নানা কাহিনীর ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে তাহা ছিল নিছক ভূতের গল্প। তাহার ভিতর বর্ণভঙ্গিমার কি রেখাবিন্যাসের কোনো বালাই ছিল না; মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাস ভয় বিস্ময় সংস্কার প্রভৃতির কোনো বিশ্লেষণ ছিল না; কেবল ছিল বিভীষিকাময় ও বিস্ময়কর রহস্য-লোকের ছবি। কিন্তু মানুষের ভাষার ক্ষমতা, চিন্তা শক্তি, আপনার অনুভূতি গুলিকেও বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সাহিত্য বস্তুর ছাঁচটির কারিগরী ও মাপ-জোখ নানা নিয়ম মানিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতের গল্পের চেহারা বহুল পরিমাণে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহাকে মানুষ নিছক ভয় ও বিস্ময়ের ঘটনামালা করিয়া রাখে নাই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনার কৌতূহল, সংশয়, বেদনা, অতৃপ্তি, ক্ষোভ, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা সকল কিছুকেই প্রকাশ করিতেছে, আপনার বিচার বুদ্ধিকে ও অধ্যাত্ম বুদ্ধিকেও টানিয়া আনিতেছে। আবার সকলগুলিকে মিলাইয়া সাহিত্য সৃষ্টির একটি সমগ্র রূপও প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে হয়ত বিশেষ একটি রস কি অনুভূতি আর সব গুলিকে ছাপাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এতখানি উঠিতে পাইতেছে না যাহাতে ইহার বিশেষ ছন্দটির পতন হয় কি তাল কাটিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত না মৃত' 'কঙ্কাল' 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'গুপ্তধন', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মাষ্টারমশায়' প্রভৃতি গল্পে এই বিস্ময়রসকে নানা ভাবে পাই। আবার 'মহামায়া' 'মধ্যবর্ত্তিনী' প্রভৃতি গল্পে যদিও ঠিক এই রসটি নাই, তবু ইহা যেন গল্পের মূল বস্তুটিকে ছুঁইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনো গল্পেই ভৌতিক বিস্ময়রস অন্যান্য রসকে ও লেখকের সংশয় ও বিশ্বাসকে ছাপাইয়া চাপা দিয়া যাইতে পারে নাই। সে আপনার মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিয়াছে।

'মণিহারা' গল্পটি সাধারণ ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য বাড়ীটি 'পোড়ো' এবং 'অভিশাপ-গ্রস্ত' বলিলে স্বভাবতই মানুষের মনে একটু রহস্যময় কৌতূহল জাগাইয়া তোলা হয়। কিন্তু তারপরই গল্পটি একেবারে আমাদের পরিচিত সংসারে নামিয়া আসিয়াছে। নায়কটি নব্যবঙ্গ, নায়িকা অলঙ্কার-বিলাসিনী সুন্দরী সুগৃহিনী; সুতরাং ইহার ভিতর রহস্য লোকাতীত হইয়া উঠিবার কোনো ঠাঁই নাই। মণিমালিকা ঢাকাই শাড়ী ও বাজুবন্ধ পরে এবং রন্ধনে নুন ঠিক দেয়; অতএব তাহাকে লইয়া যে গল্প রচিত হইবে সে তাহার স্বামীর মনোরাজ্যের ও গৃহ-কোণের সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিসের হইতে পারে? সেই ছন্দেই গল্প চলিতেছিল। হঠাৎ ছন্দ বদ্‌লাইয়া গেল। গহনা লুকাইবার তাড়ায় মণি বাপের বাড়ী পলাইলে শূন্য গৃহে নায়ক ফণি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন হঠাৎ সেই 'পোড়ো' 'অভিশাপ-গ্রস্ত', বাড়ীটার ছবি অল্পে অল্পে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইবার বুঝি কি ঘটে! গভীর রাত্রি, নির্জ্জন গৃহে 'জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকারের' সম্মুখে শ্রাবণ-বর্ষণের মাঝে একাকী জাগিয়া ফণি বসিয়া আছে; রহস্য এইখানেই গভীর হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই কঙ্কাল ও অলঙ্কারের ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্, নদীর ঘাট হইতে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত রাতের পর রাত কঙ্কালময়ী সালঙ্কারা মণি-মালিকার আসা যাওয়া, পড়িতে পড়িতে গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে। ফণি জাগিয়া উঠিয়া দেখে কেহ কোথাও নাই।

এই খানে যেই রহস্য গভীরতর হইয়া উঠিল, ভৌতিক বিস্ময় উগ্র হইয়া উঠিল, অমনি লেখনীর মুখে সংশয়ের সুর ধ্বনিয়া উঠিল। সত্য যাহা ছিল তাহা স্বপ্ন হইল; আবার স্বপ্নই সত্য কি জাগরণ সত্য সে লইয়াও দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল। কিন্তু তাহাতেই শেষ হইল না। সেই-রাত্রের স্বপ্ন-জাগরণে মিশ্রিত নাট্যের অভিনয় আবার চলিল।

এবার কঙ্কালের পিছু পিছু ঘাটে আসিয়া ফণি জলে নামিল। তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, কিন্তু নিশিতে ডাকার যে চিরপ্রচলিত গল্প আছে, সেই গল্পেরই মত তাহার পরক্ষণেই সলিল-সমাধি হইল। কঙ্কালময়ী মণিমালিকার এ ডাককে যখন গভীরতম রহস্য বিস্ময় ও ভীতির সোপানে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, তখনও তাহাকে পাছে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া যায়, তাই লেখক ফণির শেষ মুহূর্ত্তে বলিলেন, "ফণিভূষণের তন্দ্রা টুটিয়া গেল…… স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্ত্ত মাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।" পাছে রসভঙ্গ হয় তাই আগেও একথা বলেন নাই, শেষেও বেশী জোর দেন নাই। কিন্তু এই স্বপ্ন-লীলাকে এতখানি ভয়ঙ্কর করিতে তাঁহার প্রাণে লাগিল, কাজেই তার ভয়ঙ্কর রূপটা দেখাইবার পুরাপুরি আনন্দ পাইবার পর হঠাৎ সদয় হইয়া তিনি সমস্তটাকে একটা পরিহাসের ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। এতক্ষণ যে গল্প শুনিতেছিল সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার নাম ফণি-ভূষণ এবং আমার স্ত্রীর নাম ছিল নিত্যকালী।" গল্পের কাঠামোর ভিতর কোথাও ঘা লাগিল না, কারণ তাহা যত-খানি মনস্তত্ত্ব চর্চ্চা করিবার করিয়াছে, লোভ প্রেম ইত্যাদির রূপ যতখানি দেখাইবার দেখাইয়াছে, এবং পাঠ-কের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগাইয়া যতখানি ভয়ঙ্কর পরিণতিতে আনিবার তাহা আনিয়াছে। লেখকের গল্পের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরই পাঠকের বুকের বোঝাটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য সহাস্যে তিনি বলিলেন, "ওটা আগাগোড়াই পরিহাস"। এ যেন প্রাণ ভরিয়া গালা-গালি করার পর তাহা প্রত্যাহার করা। মনের ঝাল মিটাইয়া গালি দেওয়া হইল, আবার মানহানির মোকদ্দমা এবং মিথ্যাভাষণের পাপও বাঁচিয়া গেল।

এমনি করিয়া সকলগুলি বিস্ময়রসের গল্প বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় সর্ব্বত্রই নানা রসের মাত্রা কেমন ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। যে রসে যাহার বিশেষত্ব তাহাতে সে অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া যায় নাই। তাহার একটা মনগড়া মীমাংসাও করিয়া লইতে হয় নাই। তাহাও গল্পের ভিতর হইতেই হইয়া গিয়াছে।

একমাত্র 'ক্ষুধিত পাষাণে' আমরা দেখি বিস্ময়রসকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। চরম বিস্ময়ের কোঠায় পাঠককে তুলিয়া দিয়া "তিনি অকস্মাৎ ট্রেনে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। কেবল মনটা বোধ হয় একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল, তাই যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন, "লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানান।"

'ক্ষুধিত পাষাণে'র এই নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়রসের বিষয়েও বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু স্থানও নাই, সময়ও নাই, তাই থামিতে হইল।

শেষকালে কেবলমাত্র একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বিচিত্র দিক সম্বন্ধেও কিছুই বলা হয় নাই। সকল গল্পের ভিতরই যে বিশেষ একটি বিশেষত্ব আছে সে বিষয়েও কিছু বলা হয় নাই। তাঁহার ছোট গল্পমাত্রের ভিতরই একটি সুষমা ও সামঞ্জস্যের চিহ্ন আছে, তাহা কোথাও অতি বাস্তব হইবার আগ্রহে আর্টের বাঁধন ছিঁড়িয়া খবরের কাগজের পুলিশ আদালতের রিপোর্ট কিম্বা মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকের রেকর্ড বই হইয়া দাঁড়ায় নাই। পঙ্কেও যেখানে তাহার জন্ম সেখানে সে পঙ্কজ হইয়া উপরের দিকে চাহিয়াছে, কারণ আর্ট মাটি নয়, মাটি হইতে গড়া স্রষ্টার হাতের প্রতিমা, আর্ট কালি নহে, তুলির লিখনে আঁকা ছবি। সৌন্দর্য্য, সংযম, সুবিন্যা

ও সুসঙ্গতিই যে তাহার জীবন তাহা রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণ ভুলিলেও তিনি কখনও ভোলেন নাই।

—শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

গদ্য ও পদ্য

(ইংরেজি হইতে)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা,
কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধূলো-বালি,
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন সার্সি-কবাট আঁটা,—
তখন ঘেমে' হাঁপিয়ে কেসে' গদ্য লেখো খালি।

কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি',
ঝুম্‌কো-লতা দুল্‌ছে দেখি বারান্দাটির পাশে,
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ, ফুল্ল ফুলের ডালি—
তখন ওহো! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছাসে।

মগজ যখন বেজায় ভারী, যেন লোহার ভাঁটা!
বুদ্ধিত' নয়!—যেন সমান চারকোণা এক টালি!
মন্‌টা যখন দাড়ীর মতন ছুঁচলো করে' ছাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।

কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন-চতুরালি,
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—
তখন ওহো! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছাসে।

চাই যেখানে ভারিক্কে চাল—বিদ্যে বহুত ঘাঁটা,
'হ'তেই হবে' 'কথ্‌খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় "কিন্তু" "যদি"র কাঁটা—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।

কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল-কালি,
মিলন-লগন ঘনিয়ে ওঠে কনক-চাঁপার বাসে,
যে-কথা কেউ জান্‌বে নাকো, সেই কথা কয় আলি—
তখন ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছাসে।

সংসারেতে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি—
তার তরে ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি;
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে—
তখন ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছাসে।

—প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৩

সাধ্বী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

১

সম্রাট টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে, ফ্রান্সদেশের 'মার্সাইয়ে'-নগরে লাএটা আসিলিয়া নামে এক মহিলা বাস করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্তবংশীয় রোমান রাজপুরুষ হেলভিয়াসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটিও সন্তান না হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জননী হইবার বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছিল। একদিন আরাধনা

করিবার জন্য দেবমন্দিরে যাইবার কালে তিনি দেখিলেন, প্রবেশদ্বারে অনেকগুলি লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের দেহ প্রায় নগ্ন, অতিশয় শীর্ণ ও গলিতকুষ্ঠে আচ্ছন্ন! ইহাদিগকে দেখিয়া তিনি ভয়চকিত হইয়া মন্দিরের নিম্নতম সোপানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লাএটার হৃদয়ে দয়ামায়া ছিল না এমন নয়, কিন্তু এই হতভাগ্য লোকগুলির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যেমন দুঃখ হইল, তেমনই ভয়ও হইল। এমন কিম্ভূতদর্শন ভিখারীর দল তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই—কী বিবর্ণ শবাকার মূর্ত্তি! ভিক্ষাপাত্রগুলা পদতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! ইহা দেখিয়া লাএটার মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল; তিনি হাত দিয়া নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন; অগ্রসর হইবার সাহস নাই, পলাইবার উপায়ও নাই—মনে হইল, সারা দেহ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে! এমন সময়ে সেই হতভাগ্যদিগের মধ্য হইতে এক অতিশয় লাবণ্যবতী রমণী বাহির হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিল।

অপরিচিতা গম্ভীর অথচ সস্নেহ কণ্ঠে বলিল, "ভদ্রে, আপনার কোনও ভয় নাই, ইঁহারা কেহই ক্রূর নহে। ইহারা মিথ্যা বা দুর্নীতির দাস নয়—প্রেম ও সত্যের প্রচারক। আমরা 'জুডিয়া'-দেশ হইতে আসিয়াছি, তথায় ভগবানের পুত্র মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। তিনি যখন স্বর্গারোহণ করিয়া তদীয় পিতার দক্ষিণভাগে আসন গ্রহণ করিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহার ভক্তগণ বড় নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। ষ্টীফেনকে জনগণ লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছে। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ আমাদিগকে ধরিয়া এক কর্ণ ও মাস্তলহীন নৌকায় চড়াইয়া অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছিল, উদ্দেশ্য—আমরা একেবারে নিপাত হই! কিন্তু যে ঈশ্বর তাঁহার মর্ত্ত্যবাসকালে আমাদিগকে প্রেম চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনিই করুণা করিয়া সকলকে এই নগরীর বন্দরতীরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। হায়! 'মার্সাইয়ে'-বাসীরা লোভী, প্রতিমা পূজক ও হৃদয়হীন! যীশুর সেবক-সেবিকা আজ অশন-বসনের অভাবে মৃতপ্রায়—ইহারা দৃক্‌পাতও করে না! এই দেবমন্দির তাহাদের চক্ষে পবিত্র, যদি এই স্থানে আশ্রয় না লইতাম তবে এতক্ষণে বোধ হয় তাহারা আমাদিগকে অন্ধকার কারাগৃহে টানিয়া লইয়া যাইত! তাহারা বুঝিল না, আমাদিগের সদয় অভ্যর্থনা করিলে তাহাদিগের মঙ্গল হইত, কারণ আমরা সুসমাচার আনিয়াছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অপরিচিতা তাহার সঙ্গীদিগের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া, একে একে সকলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,

"ওই যে বৃদ্ধ আপনার দিকে প্রশান্ত নেত্রে চাহিয়া আছেন, উঁহার নাম সীডন—উনি সেই জন্মান্ধ, প্রভু যাঁহাকে দৃষ্টিদান করিয়াছেন! সীডন এক্ষণে গোচর ও অগোচর, সমুদয় বস্তুই, অতি পরিষ্কার দেখিতে পান! ওই যে আর একটি বৃদ্ধ -যাঁহার শ্মশ্রুরাজি শৈলতুষারের ন্যায় শুভ্র—উঁহার নাম ম্যাক্সিমিন। এই যে দেখিতেছেন—এত অল্প বয়সেই এত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন—ইনি আমার ভাই। জেরুজালেম-নগরে ইঁহার বিস্তর ধন-সম্পত্তি ছিল। উঁহার পার্শ্বে আমার ভগিনী মার্থা ও আমাদের বিশ্বস্ত পরিচারিকা, মান্‌টিলা;—সম্পদকালে এই দাসী 'বেথানী'র পর্ব্বত-কানন হইতে জলপাই তুলিয়া আনিত।"

লাএটা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি?—কী মিষ্ট তোমার কণ্ঠস্বর! কী সুন্দর মুখ!—তোমার নাম কি?"

ইহুদানী বলিল, "আমাকে লোকে মেরী মাগ্‌ডেলেন বলিয়া ডাকে। আপনার স্বর্ণখচিত বসন ও গমন-ভঙ্গীর সহজ গরিমা দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আপনি এই নগরীর কোনও রাজপুরুষের ঘরণী। এই কারণেই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আপনার স্বামীর মনে, যীশু-খ্রীষ্টের সেবক-সেবিকাগণের প্রতি একটু করুণার উদ্রেক করুন; সেই ধনীকে গিয়া বলুন, "স্বামিন্, ইহারা বিবস্ত্র, ইহাদিগকে বস্ত্র দাও; ইহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ইহাদিগকে রুটি ও পানীয় দান কর—তাহা হইলে, ঈশ্বরের নামে এখানে যে ঋণদান করিলে, তিনি স্বর্গে তাহা পরিশোধ করিবেন।"

লাএটা আসিলিয়া উত্তর করিলেন, "মেরী মাগ্‌-ডেলেন! তুমি যাহা বলিলে আমি করিব। আমার স্বামীর নাম হেলভিয়াস, ধনে মানে তিনি এই নগরীর একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আমার কোনও প্রার্থনা তিনি বেশিক্ষণ অপূর্ণ রাখেন না, কারণ আমি তাঁহার প্রণয়ভাগিনী। তোমার সঙ্গীদিগকে দেখিয়া আমার যে ভয় হইয়াছিল তাহা এক্ষণে দূর হইয়াছে; এমন কি, আমি উহাদের ওই ক্ষতপূর্ণ দেহের অতি নিকট দিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিব। আমি দেবগণের আরাধনা করিতে যাইতেছি, দেবদ্বারে আমার একটি বিশেষ কামনা আছে—সে কামনা আজিও পূর্ণ হইল না!"

মেরি মাগ্‌ডেলেন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার পথরোধ করিল এবং আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,

"না, না!—মিথ্যা প্রতিমার পূজা করিও না। পাষাণ-পুত্তলের নিকট পরমায়ু বা কামনার কথা তুলিও না। ঈশ্বর এক!—দ্বিতীয় নাই!—আমি আমার এই কেশরাশি দ্বারা তাঁহার পদতল মার্জ্জনা করিয়াছি!"

বলিতে বলিতে তাহার দীপ্ত নয়ন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশের মত ঘনকৃষ্ণ ও অশ্রুময় হইয়া উঠিল! তাহা দেখিয়া লাএটা আসিলিয়া ভাবিতে লাগিলেন,

"আমারও ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের যাহা কিছু বিধি সমুদয় আমি অন্তরের সহিত পালন করিয়া থাকি, কিন্তু এই রমণীর মধ্যে কেমন একটা স্বর্গীয় প্রেমের উন্মাদনা রহিয়াছে!"

মেরী মাগ্‌ডেলেন আবিষ্টের মত বলিয়া যাইতে লাগিল,

"তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ঈশ্বর! তথাপি তিনি আমাদেরই কুটীরদ্বারে সেই পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া গল্পচ্ছলে তাঁহার সেই নীতি কথাগুলি বলিয়া-ছিলেন! তাঁহার বয়স তরুণ!—সুন্দর দেহকান্তি! কেহ তাঁহাকে ভালবাসিলে তাঁহার বড় আহ্লাদ হইত। সেদিন রাত্রে তিনি যখন আমার ভগিনীর গৃহে আহার করিতে আসিলেন, আমি তাঁহার চরণতলে বসিয়া রহিলাম, অমনি তাঁহার মুখ হইতে অবারিত বারিধারার মত অমৃত বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল! আমার ভগিনী যখন আমার গৃহকর্ম্মে অবহেলার জন্য অনুযোগ করিয়া বলিল, 'প্রভু! একবার উহাকে বলুন, আমি আপনার আহারের আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছি, আমাকে সাহায্য করা উহার উচিত নয় কি?'—শুনিয়া তিনি হাসিলেন, আমার দোষ কাটাইয়া দিলেন—আমাকে তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিতে অনুমতি করিলেন, বলিলেন—'আমি ঠিক কাজটিই পছন্দ করিয়া লইয়াছি।'

"তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি যেন এক তরুণ মেষ-পালক, কোনও পার্ব্বত্য পল্লীতে তাঁহার বাস। তথাপি তাঁহার দুই চক্ষে যে দিব্যপ্রভা ফুটিয়া উঠিত তাহা আদি-ঋষি 'মুসা'র ললাট-নিঃসৃত জ্যোতিশ্ছটার মত! তিনি স্তব্ধ রাত্রির মত ধীর-গম্ভীর, আবার উদ্যত বজ্রের মত কঠোর! যাহাদের বয়স অল্প—যাহারা নিরভিমান, তিনি তাহাদিগকে ভালো বাসিতেন; যখন পথে চলিতেন শিশুরা তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইত, তাঁহার বসন ধরিয়া টানিত। এব্রাহাম ও জেকব যে ঈশ্বরের পূজা করিতেন, তিনি সেই ঈশ্বর।—যে হাতে তিনি সূর্য্য ও তারকাগণকে গড়িয়াছেন—সেই হাতখানি তিনি নবজাত শিশুর গণ্ডে বুলাইয়া আদর করিতেন! তাহাদের জননীরা হাসি-মুখে আপন আপন দুয়ারে দাঁড়াইয়া শিশুগুলিকে তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিত। তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল, আবার তিনি মৃতজনকে জীয়াইতে পারিতেন! ওই দেখুন লাজারাসের মুখে এখনো মৃত্যুর ছায়া রহিয়াছে, উহার দৃষ্টি এখনও ভয়বিহ্বল,—ও যে যমপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে!"

কিছুক্ষণ হইতে লাএটার কানে আর কোনো কথাই যাইতেছিল না।

এই বার তাঁহার স্বচ্ছ সরল চক্ষু দুইটি ও পরিষ্কার ক্ষুদ্র ললাটখানি ইন্দ্রদানীর পানে তুলিয়া তিনি বলিলেন,

"মেরী! আমি ভক্তিমতী, পিতৃ-পুরুষের ধর্ম্মে আমার আস্থা আছে—অভক্তি নারী জাতির পক্ষে মহাপাপ।

ধর্ম্মে কর্ম্মে নিত্য নূতন পদ্ধতি রোমীয় কুলবধূর পক্ষে একান্ত অশোভন। তথাপি আমি স্বীকার করি, তোমাদের পূর্ব্ব-দেশে যে সকল দেবতার পূজা হয় শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি যথার্থই সুন্দর; আমার মনে হয় তোমার এই ঈশ্বর ইহাদেরই একজন। তুমি বলিতেছ, ইনি শিশু ভালবাসেন, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মুখচুম্বন করেন—ইহার দ্বারা বুঝিতেছি, ইনি রমণীকুলের হিতার্থী। আমার দুঃখ হয়, এখানকার রাজকুল বা অভিজাতবংশের কেহই এই নূতন দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করেন না, নচেৎ, আমি এই দণ্ডে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার জন্য মধু ও পিঠার নৈবেদ্য সাজাইয়া আনিতাম। তথাপি, ইহুদি-কন্যা, তোমাকে আমি একটি কথা বলি। তোমাকে তোমার দেবতা ভালবাসেন বলিতেছ, তুমি তাঁহার নিকট আমার হইয়া একবার প্রার্থনা কর—আমি নিজে করিতে সাহস পাই না; আমার দেবতারা এপর্য্যন্ত সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না!"

কথাগুলি বলিবার সময় লাএটার কেমন বাধ' বাধ' ঠেকিতেছিল, তাঁহার বড় লজ্জা করিতে লাগিল, তিনি হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন।

মেরী মাগ্‌ডেলেন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে, বলুন, কোন্ অপূর্ণ কামনায় আপনার চিত্ত এমন পীড়িত হইয়াছে?"

একটু একটু করিয়া লাএটার সাহস বাড়িল, তিনি উত্তর করিলেন,

"মেরী! তুমিও আমার মতন নারী, অপরিচিত হইলেও আমার নারীহৃদয়ের গোপন কথা তোমাকে বলিতে পারি। আজ ছয় বৎসর আমি বধূ হইয়াছি, এখনও জননী হইতে পারিলাম না—এ আমার বড় দুঃখ। আমি স্নেহের পুত্তলি চাই। সে কামনা হয় ত' কখনও পূরিবে না, তথাপি তাহারই আশায় আমার বক্ষে যে স্নেহ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার পীড়ায় আমি অবসন্ন হইতেছি। মেরী মাগ্‌ডেলেন! আমার দেবতা যে সুখে আমায় বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তোমার প্রার্থনায় তোমার ঈশ্বর যদি আমাকে সেই সুখে সুখী করেন, তবে জানিব তিনি প্রকৃত সুন্দর। তখন আমিও তাঁহাকে ভক্তি করিব, আমার আত্মীয়-স্বজনকেও ভক্তি করিতে বলিব—তাহারাও আমারই মতন ধনী এবং বয়সে নবীন, তাহারাও এই নগরীর মধ্যে অতি উচ্চ শ্রেণীর কুলীন।"

মেরী মাগ্‌ডেলেন অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "রোমান-কন্যা! তুমি যখন তোমার প্রার্থিত বস্তু লাভ করিবে, তখন এই যীশু-শিষ্যার নিকট যে অঙ্গীকার করিলে তাহা স্মরণ করিও।"

লাএটা আসিলিয়া বলিলেন, "করিব। উপস্থিত এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ কর, তোমার সঙ্গীদের মধ্যে বাঁটিয়া দাও। আমি চলিলাম, এক্ষণে গৃহে ফিরিব। গৃহে ফিরিয়াই তোমার ও তোমার এই সহযাত্রীগণের জন্য ডালায় ভরিয়া রুটি ও মাংস পাঠাইয়া দিব। তোমার ভ্রাতা ভগিনী ও আর আর সকলকে বলিয়া দাও, তাহারা নির্ভয়ে এই দেবস্থান ত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে কোনও অতিথিশালায় গিয়া উঠিতে পারে। আমার স্বামী হেলভিয়াসের এই নগরে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, তাঁহার কথায় কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস পাইবে না। মেরী মাগ্‌ডেলেন, দেবগণ তোমার সহায় হউন! আমার সহিত যদি পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ হয়, কেবল জিজ্ঞাসা করিও—লাএটা আসিলিয়ার বাড়ী কোথায়? যে কেহ অনায়াসে দেখাইয়া দিবে।"

২

ছয় মাস অতীত হইয়াছে। লাএটা আসিলিয়া তাঁহার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে একখানি লাল কৌচের উপর বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া একটি ছেলে ভুলানো গান গাহিতেছেন—এই গীত তাঁহার মাতা ও মাতামহীও এককালে গাহিতেন। ফোয়ারার জলে কুলু কুলু ধ্বনি হইতেছে, জলাধারের অগভীর জলতল হইতে তিনটি মর্ম্মর নির্ম্মিত জল-দেবতার মূর্ত্তি যেন বাহির হইয়া উঠিয়া আসিতেছে।

অদূরে একটি পুরাতন পুন্নাগ বৃক্ষের পত্রাবলির মধ্যে সুখ-স্পর্শ সমীরণের মৃদুবীজন রব শোনা যাইতেছিল। যুবতীর সারা অঙ্গ যেন সুখালসে মূর্চ্ছিত, কানন-প্রত্যাগত ভ্রমরীর মত ভারমন্থর, সুপুষ্ট সুডৌল দেহখানি যেন বাহু দুইটির দ্বারা আবৃত করিয়া আছেন। গান শেষ করিয়া লাএটা একবার চারিদিকে চাহিলেন, তার পর পরিপূর্ণ গৌরবে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার পদতলে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণাঙ্গিনী ক্রীতদাসীরা কেহ সূতা কাটিতেছে, কেহ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কেহবা সীবন কর্ম্মে ব্যাপৃত,—তাহারা যেন অচিরপ্রসবা প্রভু-পত্নীর শিশুসন্তানের জন্য কে কত শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতে পারে, তাহারই পরিচয় দিতে ব্যস্ত। এক বৃদ্ধা দাসী হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখে একটি অতি ক্ষুদ্র টুপি আনিয়া ধরিল, লাএটা হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তিনিও সেইটিকে নিজের মুঠায় পরাইয়া হাসিতে লাগিলেন। লাল কাপড়ের উপর জরী ও মুক্তা থাকায় টুপিটি বড় সুন্দর দেখাইতেছে—সে যেন বন্দিনী কাফ্রী ক্রীতদাসীর স্বপনের মতই মনোহর!

এমন সময়ে অন্তঃপুরবাটিকায় এক অপরিচিতা রমণী প্রবেশ করিল। তাহার বসন পথধূলির ন্যায় ধূসর, কোথাও জোড় বা সিলাই নাই—একখানি অখণ্ড বস্ত্রের আচ্ছাদন; তাহার কেশ ভস্মমলিন, কিন্তু অশ্রুক্ষীণ বদনমণ্ডল সুন্দর ও জ্যোতির্ম্ময়।

তাহাকে ভিখারিণী মনে করিয়া দাসীরা তাড়াইয়া দিতেছিল, কিন্তু লাএটা আসিলিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং শয্যাসন ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে তাহার সন্নিধানে গমন করিলেন।

তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মেরী! মেরী! তুমি সত্যই তোমার দেবতার প্রিয়পাত্রী! পৃথিবীতে তুমি যাঁহাকে ভালবাসিতে, স্বর্গ হইতে তিনি তোমার কথা শুনিয়াছেন, তোমার অনুরোধে তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। এই দেখ—" বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সেই লাল টুপিটি দেখাইয়া বলিলেন, "আমি বড় সুখী হইয়াছি, তুমি আমার বড় উপকার করিলে।"

মেরী মাগ্‌ডেলেন বলিল, "লাএটা আসিলিয়া, আমি ইহা পূর্ব্বেই জানিতাম। এক্ষণে যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে তোমাকে দীক্ষিত করিতে আসিয়াছি।"

অনন্তর মার্সাইয়ে-বাসিনী দাসীদিগকে বিদায় করিয়া লাএটা ইহুদানীকে একটি গজদন্তনির্ম্মিত স্বর্ণখচিত শয্যাসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্তু মেরী মাগ্‌ডেলেন নিতান্ত বিতৃষ্ণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই বায়ু-বিকম্পিত পত্র-মর্ম্মর-মুখরিত পুন্নাগবৃক্ষটির ছায়ায় ধূলার উপর উপবেশন করিল।

মেরী বলিতে লাগিল—"বিজাতির কন্যা! তুমি মহাপ্রভুর সেবক-সেবিকার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর নাই, এই কারণে আমি নিজে যীশুকে যেমন জানিয়াছি তোমাকে ও তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ উপদেশ করিব। আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসি, তুমিও সেইরূপ বাসিতে পারিবে। সেই পরমসুন্দর পুরুষোত্তমকে আমি যখন প্রথম দর্শন করি তখন আমি পাপী ছিলাম।"

অতঃপর কেমন করিয়া কুষ্ঠরোগী সাইমনের গৃহে গিয়া সে যীশুর চরণে পতিত হইয়াছিল, কেমন করিয়া প্রভুর ভুবনপাবন চরণযুগলে মর্ম্মর ভৃঙ্গার হইতে সবটুকু গন্ধ-তৈল নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিল—সে কাহিনী বলিল। অজ্ঞ নিরক্ষর শিষ্যগণের অসঙ্গত বাক্যের উত্তরে তিনি যে সকল পুণ্যবাণী বলিয়াছিলেন তাহাও পুনরাবৃত্তি করিল।

"যীশু বলিলেন, 'তোমরা এই নারীকে ভর্ৎসনা করিতেছ কেন? ও উচিত কার্য্যই করিয়াছে। দেখ, দীন-দরিদ্রের সঙ্গ তোমরা সর্ব্বদাই পাইবে, আমাকে চিরদিন পাইবে না। এই নারী যে আমার অঙ্গ তৈলচর্চ্চিত করিয়াছে, ইহাতে উঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ আমার এই দেহ শীঘ্র মৃত্তিকা তলে সমাধিস্থ হইবে—সে জন্য এই শেষ-কৃত্যের প্রয়োজন ছিল। আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, আমার সদ্ধর্ম্ম জগতের যেখানেই প্রচারিত হইবে, সেইখানে এই ঘটনা

কীৰ্ত্তিত হইবে এবং এই নারীও সর্ব্বত্র পূজিত হইবে।' "

তদনন্তর, তাহার দেহমধ্যে যে সাতটি পিশাচ ভীষণ দৌরাত্ম্য করিতেছিল তাহাদিগকে যীশু কেমন করিয়া তাড়াইয়া দেন, সেই ঘটনা সে বর্ণনা করিল। পরিশেষে বলিল,

"সেই দিন হইতে প্রেম ও ভক্তির পুলক-শিহরণে আমি তন্ময়, সুখের আবেশে আমার সারাপ্রাণ যেন আতুর হইয়া আছে। আমি যেন সর্ব্বদা আমার প্রভুর পদচ্ছায়ায় এক নূতন স্বর্গোদ্যানে বাস করিতেছি!"

অতি শুভ্র স্বচ্ছন্দজাত লিলি-ফুলে প্রান্তর ছাইয়া গিয়াছে, যীশুর সহিত সেও সেই ফুলরাশির পানে চাহিয়া থাকিয়াছে। শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক হইলে প্রাণের মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দের উদ্রেক হয়, সেই আনন্দের কথা সে বলিল। অতঃপর যীশু কেমন করিয়া মিথ্যা অভিযোগে ধৃত হইলেন, এবং অনুচরবর্গের মুক্তির জন্য নিজে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিলেন—সেই কাহিনী বিবৃত করিল। ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর সেই অপূর্ব্ব যন্ত্রণা, পরে মৃত্তিকাতলে সমাধি ও পুনরুত্থান—একে একে সকল কথাই বিস্তারিত করিয়া শুনাইল।

হঠাৎ মেরী বলিয়া উঠিল, "আমিই প্রথম প্রভুকে পুনর্জ্জীবিত অবস্থায় দেখি। যেখানে তাঁহার দেহ রক্ষা করা হইয়াছিল তথায় গিয়া দেখি, দুই শুভ্রবসন দেবদূত —একজন শিয়রে ও একজন পাদদেশে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'বাছা, কাঁদিতেছ কেন?' আমি বলিলাম, 'আমি আমার প্রভুকে হারাইয়াছি! তাঁহার দেহ যে কোথায় রাখিয়াছে তাহাও জানি না!—তাই কাঁদিতেছি।'

"এমন সময়ে কি দেখিলাম! আনন্দ যে আর ধরে না!—দেখিলাম যীশু স্বয়ং আমার দিকে উঠিয়া আসিতেছেন! প্রথমে মনে হইল, বুঝি-বা উদ্যানরক্ষক; কিন্তু তিনি যেই 'মেরী!' বলিয়া আমায় ডাকিলেন,' অমনি চিনিতে পারিলাম—আমার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'প্রভু আমার!' তিনি অতি ধীরে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি এখনো আমার পিতার সামীপ্য লাভ করি নাই।' "

এই চরিত-কথা শুনিতে শুনিতে লাএটা আসিলিয়ার মন হইতে সুখ-সন্তোষ যেন অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। নিজের অতীত ও বর্ত্তমান ভাবিয়া মনে হইল, এই যে নারী একজন সত্যকার দেবতাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহার নিজের জীবন কী নিরর্থক! সম্ভ্রান্ত-বংশের দুহিতা, ধর্ম্মভীরু তরুণীর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কথা যাহা মনে পড়ে, সে ত' সমবয়সী সখীজনের সঙ্গে এক পাত্রে পিষ্টক ভোজনের কথা! হেলভিয়াসের আদর, সার্কাসের ক্রীড়াকৌতুক, এবং গৃহে বসিয়া সূচীকর্ম্ম—এ সব কতকটা উল্লেখযোগ্য হইলেও মেরী মাগ্‌ডেলেনের যে কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার দেহ ও অন্তরাত্মা তীব্র চেতনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে—তাহার তুলনায় সে সকল কী তুচ্ছ! তাঁহার হৃদয় দারুণ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল।

এই ইহুদানীর মুখ দেখিয়াও তাঁহার ঈর্ষ্যা হইল,— অনুতাপিনীর ভস্মমলিন দেহে এখনও অপরূপ রূপলাবণ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! তাহার দেবতা-ঘটিত সুখদুঃখের কথায়, এমন কি তাহার শোকসন্তাপেও, তিনি যেন ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন।

এইবার তিনি দুই হাতে অশ্রুরোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"ইহুদীর কন্যা! তুমি এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যাও! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আমি কত স্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, নিজেকে কত সুখী মনে করিয়াছিলাম! জীবনে যে আর কোনও প্রকার সুখ আছে, এ ধারণাও আমার ছিল না। আমার স্বামী হেলভিয়াসের প্রেম ভিন্ন আর কোনোরূপ প্রেমের কথা আমি কখনও ভাবি নাই। আমার মাতা ও মাতামহীর মত দেবপূজা করিয়া যে ধর্ম্মসুখ পাই, তদ্‌ভিন্ন আর কোনও স্বর্গীয়

আনন্দের বার্ত্তা আমার জানা ছিল না। হাঁ, এতক্ষণে বুঝিয়াছি—তুই পিশাচী! আমার জীবনের যাহা কিছু সুখ তাহা তুই নষ্ট করিতে আসিয়াছিলি—কিন্তু পারিলি কই? যে জীবন্ত প্রত্যক্ষ দেবতাকে তুই ভালবাসিয়াছিলি তাহার কথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? তুই সেই মহাপুরুষের মৃত্যু ও পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখিয়াছিস বলিয়া আমার নিকটে গর্ব্ব করিতেছিস্, তাহাতে আমার কি?—আমি ত' আর স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না! আমি সন্তানবতী হইয়া যে একটু সুখের আশা করিতেছি, তাহাও নষ্ট করিবি? তুই পাপিষ্ঠা! আমি তোর দেবতার কোনো কথা শুনিব না। তুই তাঁহাকে যেরূপ ভালোবাসিয়াছিস্—তাহা অতিরিক্ত, তাহা গর্হিত! আলুলায়িতকেশে পদতলে লুটাইয়া না পড়িলে সে দেবতা প্রসন্ন হন না! জানিস্, আমি সম্ভ্রান্তবংশের কুলস্ত্রী,—এমন মতিগতি আমার শোভা পায়? তেমন করিয়া পূজা করিতে দেখিলে হেলিভিয়াস্ অসন্তুষ্ট হইবেন। যে পূজায় রমণীর বেণীবন্ধন নষ্ট হয়, তেমন পূজা নাই করিলাম! না!—মিথ্যা নয়!—আমার গর্ভে যে শিশু আসিয়াছে তাহাকেও তোর ওই খ্রীষ্টের কথা শুনাইতে দিব না। যদি কন্যা হয় তাহা হইলে, আমাদের দেশে মাটী পুড়াইয়া যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবদেবী নির্ম্মাণ করে—তাহাদিগকেই পূজা করিতে শিখিবে, ইচ্ছা হয় সেগুলিকে খেলার সামগ্রীও করিতে পারিবে—তাহাতে বিপদ নাই। শিশু ও জননীগণের পক্ষে এইরূপ দেবতাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়। তুই বড় গর্ব্ব করিয়া আমাকে তোর প্রেমের কাহিনী শুনাইতে আসিয়াছিস্—আমাকেও মজাইতে চাস্! তোর আস্পর্দ্ধা কম নয়! তোর্ দেবতাকে তুই পূজা কর্—আমি করিব কেন? আমি কি তোর মত পাপ করিয়াছি? আমাকে সাতটা পিশাচেও পায় নাই, আমি তোর মত মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়াও বেড়াই না—জানিস্ না, আমি ভদ্রঘরের কুলবধূ! তুই এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যা!"

তখন মেরী মাগ্‌ডেলেন বুঝিতে পারিল, নবধর্ম্ম-প্রচার তাহার কর্ম্ম নয়। তাই অতঃপর সে অরণ্যমধ্যে এক নির্জ্জন গুহায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিল। এই গুহাটির নাম হইয়াছিল 'পুণ্য-গুম্ফা'। পুরাণকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এই যে ঘটনা আমি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, ইহার অনেক পরে লাএটা আসিলিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। *

প্রাবৃট

(ঋতুসংহার অবলম্বনে)

শ্রী কালিদাস রায়

নীপসৌরভে ভরি দশ দিশি নৃপগৌরবে আজ—
অই—এসেছে প্রাবৃটরাজ।
সজল জলদ গজযূথ তার তড়িতে কেতন উড়ে
সঘন অশনি মর্দ্দলে ধ্বনি ঘোষিছে অবনী জুড়ে।
আজি—প্রাবৃট পশিল পুরে।

* আনাতোল ফ্রাঁস-এর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে।

কীর্ত্তিত হইবে এবং এই নারীও সর্ব্বত্র পূজিত হইবে।' "

তদনন্তর, তাহার দেহমধ্যে যে সাতটি পিশাচ ভীষণ দৌরাত্ম্য করিতেছিল তাহাদিগকে যীশু কেমন করিয়া তাড়াইয়া দেন, সেই ঘটনা সে বর্ণনা করিল। পরিশেষে বলিল,

"সেই দিন হইতে প্রেম ও ভক্তির পুলক-শিহরণে আমি তন্ময়, সুখের আবেশে আমার সারাপ্রাণ যেন আতুর হইয়া আছে। আমি যেন সর্ব্বদা আমার প্রভুর পদচ্ছায়ায় এক নূতন স্বর্গোদ্যানে বাস করিতেছি!"

অতি শুভ্র স্বচ্ছন্দজাত লিলি-ফুলে প্রান্তর ছাইয়া গিয়াছে, যীশুর সহিত সেও সেই ফুলরাশির পানে চাহিয়া থাকিয়াছে। শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক হইলে প্রাণের মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দের উদ্রেক হয়, সেই আনন্দের কথা সে বলিল। অতঃপর যীশু কেমন করিয়া মিথ্যা অভিযোগে ধৃত হইলেন, এবং অনুচরবর্গের মুক্তির জন্য নিজে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিলেন—সেই কাহিনী বিবৃত করিল। ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর সেই অপূর্ব্ব যন্ত্রণা, পরে মৃত্তিকাতলে সমাধি ও পুনরুত্থান—একে একে সকল কথাই বিস্তারিত করিয়া শুনাইল।

হঠাৎ মেরী বলিয়া উঠিল, "আমিই প্রথম প্রভুকে পুনর্জ্জীবিত অবস্থায় দেখি। যেখানে তাঁহার দেহ রক্ষা করা হইয়াছিল তথায় গিয়া দেখি, দুই শুভ্রবসন দেবদূত—একজন শিয়রে ও একজন পাদদেশে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'বাছা, কাঁদিতেছ কেন?' আমি বলিলাম, 'আমি আমার প্রভুকে হারাইয়াছি! তাঁহার দেহ যে কোথায় রাখিয়াছে তাহাও জানি না!—তাই কাঁদিতেছি।'

"এমন সময়ে কি দেখিলাম! আনন্দ যে আর ধরে না!—দেখিলাম যীশু স্বয়ং আমার দিকে উঠিয়া আসিতেছেন! প্রথমে মনে হইল, বুঝি-বা উদ্যানরক্ষক; কিন্তু তিনি যেই 'মেরী!' বলিয়া আমায় ডাকিলেন, অমনি চিনিতে পারিলাম—আমার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'প্রভু আমার!' তিনি অতি ধীরে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি এখনো আমার পিতার সামীপ্য লাভ করি নাই।' "

এই চরিত-কথা শুনিতে শুনিতে লাএটা আসিলিয়ার মন হইতে সুখ-সন্তোষ যেন অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। নিজের অতীত ও বর্ত্তমান ভাবিয়া মনে হইল, এই যে নারী একজন সত্যকার দেবতাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহার নিজের জীবন কী নিরর্থক! সম্ভ্রান্ত-বংশের দুহিতা, ধর্ম্মভীরু তরুণীর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কথা যাহা মনে পড়ে, সে ত' সমবয়সী সখীজনের সঙ্গে এক পাত্রে পিষ্টক ভোজনের কথা! হেলভিয়াসের আদর, সার্কাসের ক্রীড়াকৌতুক, এবং গৃহে বসিয়া সূচীকর্ম্ম—এ সব কতকটা উল্লেখযোগ্য হইলেও মেরী মাগ্‌ডেলেনের যে কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার দেহ ও অন্তরাত্মা তীব্র চেতনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে—তাহার তুলনায় সে সকল কী তুচ্ছ! তাঁহার হৃদয় দারুণ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল।

এই ইহুদানীর মুখ দেখিয়াও তাঁহার ঈর্ষ্যা হইল,—অনুতাপিনীর ভস্মমলিন দেহে এখনও অপরূপ রূপলাবণ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! তাহার দেবতা-ঘটিত সুখদুঃখের কথায়, এমন কি তাহার শোকসন্তাপেও, তিনি যেন ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন।

এইবার তিনি দুই হাতে অশ্রুরোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"ইহুদীর কন্যা! তুমি এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যাও! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আমি কত স্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, নিজেকে কত সুখী মনে করিয়াছিলাম! জীবনে যে আর কোনও প্রকার সুখ আছে, এ ধারণাও আমার ছিল না। আমার স্বামী হেলভিয়াসের প্রেম ভিন্ন আর কোনোরূপ প্রেমের কথা আমি কখনও ভাবি নাই। আমার মাতা ও মাতামহীর মত দেবপূজা করিয়া যে ধর্ম্মসুখ পাই, তদ্‌ভিন্ন আর কোনও স্বর্গীয়

আনন্দের বার্ত্তা আমার জানা ছিল না। হাঁ, এতক্ষণে বুঝিয়াছি—তুই পিশাচী! আমার জীবনের যাহা কিছু সুখ তাহা তুই নষ্ট করিতে আসিয়াছিলি—কিন্তু পারিলি কই? যে জীবন্ত প্রত্যক্ষ দেবতাকে তুই ভালবাসিয়াছিলি তাহার কথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? তুই সেই মহাপুরুষের মৃত্যু ও পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখিয়াছিস বলিয়া আমার নিকটে গর্ব্ব করিতেছিস্, তাহাতে আমার কি?—আমি ত' আর স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না! আমি সন্তানবতী হইয়া যে একটু সুখের আশা করিতেছি, তাহাও নষ্ট করিবি? তুই পাপিষ্ঠা! আমি তোর দেবতার কোনো কথা শুনিব না। তুই তাঁহাকে যেরূপ ভালোবাসিয়াছিস্—তাহা অতিরিক্ত, তাহা গর্হিত! আলুলায়িতকেশে পদতলে লুটাইয়া না পড়িলে সে দেবতা প্রসন্ন হন না! জানিস্, আমি সম্ভ্রান্তবংশের কুলস্ত্রী,—এমন মতিগতি আমার শোভা পায়? তেমন করিয়া পূজা করিতে দেখিলে হেলিভিয়াস্ অসন্তুষ্ট হইবেন। যে পূজায় রমণীর বেণীবন্ধন নষ্ট হয়, তেমন পূজা নাই করিলাম! না!—মিথ্যা নয়!—আমার গর্ভে যে শিশু আসিয়াছে তাহাকেও তোর ওই খ্রীষ্টের কথা শুনাইতে দিব না। যদি কন্যা হয় তাহা হইলে, আমাদের দেশে মাটী পুড়াইয়া যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবদেবী নির্ম্মাণ করে—তাহাদিগকেই পূজা করিতে শিখিবে, ইচ্ছা হয় সেগুলিকে খেলার সামগ্রীও করিতে পারিবে—তাহাতে বিপদ নাই। শিশু ও জননীগণের পক্ষে এইরূপ দেবতাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়। তুই বড় গর্ব্ব করিয়া আমাকে তোর প্রেমের কাহিনী শুনাইতে আসিয়াছিস্—আমাকেও মজাইতে চাস্! তোর আস্পর্দ্ধা কম নয়! তোর্ দেবতাকে তুই পূজা কর্—আমি করিব কেন? আমি কি তোর মত পাপ করিয়াছি? আমাকে সাতটা পিশাচেও পায় নাই, আমি তোর মত মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়াও বেড়াই না—জানিস্ না, আমি ভদ্রঘরের কুলবধূ! তুই এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যা!"

তখন মেরী মাগ্‌ডেলেন বুঝিতে পারিল, নবধর্ম্ম-প্রচার তাহার কর্ম্ম নয়। তাই অতঃপর সে অরণ্যমধ্যে এক নির্জ্জন গুহায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিল। এই গুহাটির নাম হইয়াছিল 'পুণ্য-গুম্ফা'। পুরাণকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এই যে ঘটনা আমি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, ইহার অনেক পরে লাএটা আসিলিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। *

প্রাবৃট

(ঋতুসংহার অবলম্বনে)

শ্রী কালিদাস রায়

নীপসৌরভে ভরি দশ দিশি নৃপগৌরবে আজ—
অই—এসেছে প্রাবৃটরাজ।
সজল জলদ গজযূথ তার তড়িতে কেতন উড়ে
সঘন অশনি মর্দ্দলে ধ্বনি ঘোষিছে অবনী জুড়ে।
আজি—প্রাবৃট পশিল পুরে।

---

* আনাতোল ফ্রাঁস-এর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে।

মেঘের মন্দ্র শুনি মাতঙ্গ মেতে উঠে মদ ভরে
রোষে—অনুহুঙ্কার করে।
ষট্‌পদগণ নব মদ-লোভে গণ্ডে তাহার বসে,
উৎপল ভ্রমে নৃত্যবিতত শিখীর কলাপে পশে
হ্রদে—তেয়াগিয়া তাম রসে।

গিরির দগ্ধ হৃদয় জুড়ায় প্রেমময় মেঘগুলি,
করি—বারবার কোলাকুলি।
সমূলে উপাড়ি পুলিনের তরু মলিন-সলিল-মতি,
কুলটার মত তটিনী ছুটিছে যেথা তার উপপতি,
কূলে—কে রোধে তাহার গতি ?

বিজুরীতে পুড়ে যায় যাক্ পাখা চাতকী ছুটিছে তবু,
তারে—ডেকেছে প্রাণের প্রভু।
আজিকে অবলা সহসা-সবলা করে দূরে অভিসার,
স্বভাব-চপলা চপলা ঘুচায় পথের অন্ধকার,
মেঘে—চমকিয়া বারবার।

তাপদাহহারি লভি নববারি আজি ধরানারী সুখে
ধারা—স্নান করি কৌতুকে,
ইন্দ্রগোপের বিক্রম, নব তৃণমরকতরাজি,
নবকন্দলী-ইন্দ্রনীলের রম্য ভূষায় সাজি
রূপে—বরবর্ণিনী আজি।

নিতম্বিনীর শ্রোণি-চুম্বিত লম্বিত কেশপাশে
স্ফুট—চারুকদম্ব হাসে।
ত্যজি অনঙ্গে আজি অঙ্গনা ইন্দ্রদেবেরে পূজে,
সন্ধ্যার মেঘমন্দ্রে কৃপার ইঙ্গিত বলি বুঝে
ত্বরা—বন্ধুর গৃহ খুঁজে।

প্রেয়সী কানন-রমার আনন সাজায় প্রাবৃট আজ
চুমি—ভেঙে দিয়ে তার লাজ।
শোভায় কুটজে কটিতট, শ্রুতি তরল মুকুতাফলে,
কবরীতে দেয় সুরভি করবী, মালতী-যূথিকাদলে
তার—মালা গেঁথে দেয় গলে।

নববারিসেকে রোমে রোমে জাগে নারীদেহে অঙ্কুর
কাল-অগুরুতে ভুর ভুর।
পৌর প্রাসাদে বজ্রের নাদে কামিনীরা কাঁপে ডরে,
মানিনী ভামিনী মান ভুলি নিজ দয়িতে আঁকড়ি ধরে
ভয়ে—নিশীথ শয়ন 'পরে।

পথিকদয়িতা শয্যাশায়িতা মরে খর স্মর শরে,
তার—নয়নে বাদর ঝরে।
তনুদাহ অনুলেপন মাল্যে দূর হয়নাক তার
একে একে সব ভূষাবৈভব করিয়াছে পরিহার,
লঘু—দুকুল হয়েছে সার।

চলে বায়ু অতিমন্থরগতি শীকরনিকর বহি'
ধীরে—বিরহিচিত্ত দহি।
আরো মন্থর চলে পয়োধর, বিষে অন্তর জরে,
প্রবাসীজনের দীর্ঘদিবস মন্থরতায় ভরে,
তার—গজগমনারে স্মরে।

নভঃসতীর পীন-পয়োধরে দুলিছে তড়িৎ-হার,
আজ, হরিতে হৃদয় কার?
শৈল-শিখরে শিখা বিস্তারি' শিখীরা নৃত্য করে,
ময়ূর পুচ্ছ ধরি' যেন গিরি মৌলিচূড়ার 'পরে।
আজ—গিরিধারীরূপ ধরে।

সায়েব-বিবি-গোলাম

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিধাতাপুরুষ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেনও বিস্তর—কিন্তু আর কি হয়?—হলেই বা বিধাতার নিজের ভুল!

ত্রিভঙ্গমুরারী হয়েই ভূমিষ্ঠ হ'ল—প্রতিঅঙ্গের সঙ্গে প্রতিঅঙ্গেরই যেন আড়ি!

এই ছত্রিশ বছর তেমনি আড়িই ত চলেছে!—পথে যেতে সবাই একবার মুখ ফিরিয়ে চায়।—মরুভূমির প্রাণি-বিশেষের কথাই মনে পড়ে বটে সে গতি-ভঙ্গি দেখলে।

আর কিছু মনে হয় কি?

সহজে মনে হবার যো নেই। সে মুখ দেখতে পেলে ত!

দূর থেকে যদি-বা সম্ভব, কাছে থেকে সে মুখ দেখা যায় না। সাধারণ লোকের হিসাবে সেটা প্রায় মেঘ-লোকেরই কাছাকাছি!

——শচী স্বামীকে টুল থেকে নামিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, "সরো সরো, ও কি তোমার কর্ম্ম, এস ত গণেশ, পেরেকটা মার দিকি এখানে।"

গণেশ কোল থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে গিয়ে পেরেক ধরে।

শচী বলে, "কেমন? বলেছিলাম কি না, গণেশ দাঁড়িয়েই নাগাল পাবে?—তুমি ত টুল চেয়ার রাজ্যি শুধু শুধু এনে মনুমেণ্ট বানাচ্ছিলে!"

চারু আধ-ব্যাজার আধ-তামাসাভরে হেসে বলে, "সবাই ত আর মইএর খরচ বাঁচাবার জন্যে তালগাছ হ'তে পারে না!"

"না গো না—তাল গাছ ভাল, অনেক কাজে লাগে! ……এই আমার মাথা খেয়েছে! ও আমার শ্রাদ্ধ করতে কি করলে ঠাকুরপো!"

গণেশ হাতুড়ি থামিয়ে ভীত বিহ্বল নির্ব্বোধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, "কেন?"

"আ তোমার মরণ, আবার বলে কেন? পেরেকটা মরতে পিট্টতে সবটা পুতে ফেললে! ছবি কি তোমার মাথায় টাঙাব? গাড়োল্ কোথাকার!"

গণেশ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বোকার মত চেয়ে থাকে। চারু বৌএর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে।

"তুমি হেস না বাপু, আমার গা জ্বালা করে, একটা কাজ কি এ গো-মুখ্খুকে দিয়ে করাবার যো নেই! যা করতে বলব তাতেই একটা কীর্ত্তি করে বসে থাকবে! তোমার মাথায় কি আছে বলতে পার?—ষাঁড়ের গোবর?"

অত্যন্ত অপরাধীর মত সে মিট্-মিট্ করে চায়!

টুলটা টেনে নিয়ে বসে চারু বলে, "তোমাদের যদি দয়া মায়া একটু থাকে, তুলতেও যতক্ষণ নামাতেও ততক্ষণ। বেচারীকে একেবারে আকাশ থেকে ধপ্ করে মাটিতে ফেলে দিলে!"

অপ্রতিভভাবে গণেশ হাসে একটু!

শচী ধমক দিয়ে বলে, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? আমার আর কাজ নেই!"

ছেলেটা তখন দাওয়ায় পড়ে চীৎকার সুরু করেছে!

—"ওদিকে ছেলেটাকে ত নামিয়ে দিয়ে এলে ভিজে মেজেয় ওই সর্দ্দি কাশির ওপর! না, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না!"

থতমত খেয়ে গণেশ বলে, "পেরেকটা তুলে ফেলব বৌদি ?"

"পুঁতেছ ত মরতে পিট্‌টে, এখন কি দিয়ে তুলবে ? শুধু হাতে ?"

শুধু হাতেই গণেশ পেরেক ধরে টান দেয়,—যেমন প্রকাণ্ড লম্বা, তেমনি কদাকার হাতগুলি !

"সাধে কি তোমায় বলদ বলি, শুধু শুধু অমনি টান্‌লে পেরেক ওঠে ! হাতুড়ি দিয়ে এধারে ওধারে বেশ করে কবার ঘা দাও আগে !"

কিন্তু হাতুড়ির দরকার হয় না। শুধু হাতের টানেই পেরেক উঠে আসে।

"মাগো ! কি হাতের জোর গো ! শুধু হাতে পেরেকটা তুলে ফেল্লে !"

—শচীর ডাগর চোখ আরো ডাগর হয়ে ওঠে, বিস্ময়ে প্রশংসায়, আঁনন্দে।

দশ বছরের মেয়ের মত লজ্জায় গণেশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

চারু বলে, "কি আর বাহাদুরী ! আলগা পেরেক একটা, হাত দিয়ে তুলেছে বই ত নয় !"

"তাই ত ! তোমার হাড়ে হ'ত না !"—শচী ছবিটা তুলে ধরে বলে, "নাও, পেরেকটা ভাল করে ঠুকে ছবিটা টাঙাও—আবার যেন উল্টোকরে টাঙিয়ো না, তোমাকে বিশ্বাস নেই।"

অত্যন্ত সাবধানে গণেশ পেরেক ঠোকে। হাতুড়ির ঘা দেয়, আবার থামে, ভাল করে একবার দেখে, একবার বৌদির মুখের দিকে চায়, তারপর আবার একটা ঘা দেয়।

"তবেই হয়েছে ! ওই একটা পেরেক মারতেই তুমি বুড়া হয়ে যাবে দেখছি ! আমার মুখের দিকে চাইছ কি বল দেখি ! জোরে আর ছুটো ঘা দাও।"

আশ্বস্ত হয়ে গণেশ জোরে আর-এক ঘা দেয়। মাটির দেয়ালে খানিকটা চিড় ধরে।

শচী ভয় পেয়ে বলে, "থাক্ থাক্ খুব হয়েছে ! মুখ্‌খু গোঁয়ার কোথাকার !"

ছবি টাঙানো হয়। ছেলেটাকে চারুর কোল থেকে নিয়ে আবার গণেশ বলে, "আমি তোমায় খুব ভালো ছবি একটা এনে দেব বৌদি, কাল ফুটপাথে দেখে এসেছি, সে রকম ছবি একটিও ঘরে নেই তোমার।"

"কি রকম ?"

"গো-মাতার ছবি ! এই যে গরুকে মুখে সবাই ভগবতী বলে, তার গায়ে কোথায় কি দেবতা আছে কেউ জানে ?"

"ও সে ছবি ঢের দেখেছি।"—শচী রান্নাঘরের দিকে যায়।

অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে গণেশ বোঝাতে চেষ্টা করে—এ গো-মাতার ছবি সে রকম ছবি মোটেই নয়, এ হল আসল ছবি। শাস্ত্রমত যেখানকার যে দেবতা, যে দেবতার যে রূপ তা কটা ছবিতে মেলে ? এ হল ধ্যানে পাওয়া ছবি ! ছবিওয়ালাকে দেখলেই তোমার ভক্তি হবে বৌদি।

চারু বলে, "বুঝলাম ত সবই, কিন্তু আর ছবি ঢুকলে ত আমাদের বেরুতে হয় !"

ঘরে আর জায়গা নেই বটে। আসবাব-পত্রে ভরাট হয়ে, ছোট মাটির ঘরের দেয়ালের যেটুকু সামান্য অনাবৃত ছিল তা ছবিতে ঢাকা পড়েছে।

শচীর ছবির সখ্ ! জার্ম্মানির ছাপাখানার আমদানি দেব-দেবীতে ঘর বোঝাই ! সদ্য-টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে শচী বলে, "ও গো-মাতার ছবিতে কাজ নেই ! এই রকম ছবি হ'ত ত বুঝতাম।"

'এ রকম ছবিটি'তে শিল্পীর কেরামতিতে কাঁচি-দিয়ে-কাটা রাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তিতে বিলেতের শীতকালের নদী-তীরের দৃশ্যের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন।

গণেশ বিমর্ষ হয়ে যায়, বলে, "তুমি পছন্দ করবে ভেবে আমি তাকে দু আনা বায়না দিয়ে এলাম—"

"তৈরী ছবির আবার বায়না কি হে ! কাছে আর পয়সা ছিল'?"—চারু হাসে।

গণেশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

শচী বলে, "আচ্ছা আচ্ছা, তুমি নিয়ে এস আজ।"

ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ করে আটটা বাজে।

"ধর বৌদি, আবার আজ দেরী হয়ে যাবে।"—কোল থেকে ছেলেটাকে শচীর কোলে নামিয়ে দিতে যায়।

"আর একটুখানি ধর ঠাকুরপো। এই ভাতের ফেনটা গেলেই আসছি।"

ক্ষীণ আপত্তির স্বরে গণেশ বলে, "আমার কিন্তু আফিসের দেরী হয়ে যাবে বৌদি।"

... ...

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শচী বলে, "বিকেলে আবার সকাল সকাল এসো ঠাকুর পো, ও যা দস্যি ছেলে কারুর কাছে থাকবে না নইলে—।"

গণেশ তখন গলির কাদা ডিঙোতে ডিঙোতে দৌড়ে চলেছে। ন'টায় কোন্ মোটরের কারখানায় তাকে হাজিরা দিতে হয়। এখনও খাওয়া আছে, নাওয়া আছে...

চারু শচীর দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসে।

নিজের দাদাও নয়, বৌদিও নয়।

নিজের কেউই নয়। বুড়ো মা বলে, "তোর কোন্ কূলের কে তারা, যে দিন-রাত তাদের বাড়ি পড়ে থাকিস্ —কুকুরের মত? বাড়ির সঙ্গে শুধু খাওয়া আর ঘুমের সম্পর্ক?"

বড় ভাইএরা বলে, "সে সম্পর্কটুকুও রাখা কেন? দরকার নেই! খাবার শোবার বন্দোবস্ত যেন কাল থেকে সেখানেই হয়!"

ঘাড় হেঁট করে এক মনে গণেশ যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি গ্রাসের পর গ্রাস ভাত মুখে তোলে। চিবোবার পর্য্যন্ত সময় নেই।

ভাইএরা আরো বলে, "ওর কি? ওর কি লজ্জা সরম আছে? আমাদের যে মাথা কাটা যায়! লোকে যখন বলে, 'ওগো তোমার ভাইকে দেখে এলাম এক হাতে ছেলে এক হাতে বাজার নিয়ে পালেদের বাড়ি ঢুকছে', —'ওগো তোমার ভাইকে দেখে এলাম পালেদের টিনের চালে পুডিং লাগাচ্ছে' তখন কি মনে হয় বলত—?"

গণেশ ততক্ষণ খাওয়া সেরে আঁচাতে গেছে।

ভাইএরা বলে, "সামনেই এই, লোকে পেছনে ত বলতে কিছু বাকী রাখে না। আর সত্যিই ত, বয়স্টা কি কম হল! বিয়ে হলে এত দিনে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে হ'ত যে!"

বুড়ি মা এবার রেগে গিয়ে বলে, "দোষ ত তোদের, তোরা বিয়ে দিলি না, কিছু করলি না, ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেল! এখনও কি পারিস না একটা ধরে টরে দিয়ে সংসারী করে দিতে—? তা তোদের চাড় আছে কি? ওর কপালে অনেক দুর্গতি আছে আমি জানি।"

বুড়ি মার চোখে জল আসে।

ভাইএরা জবাব দেয়, "সব জেনে শুনে ন্যাকা সাজ কেন বলত? চেষ্টার কিছু কসুর হয়েছে! কে বিয়ে দেবে তোমার ওই মুখ্‌খু কার্ত্তিক ছেলের সঙ্গে—! বুদ্ধির নাম ত অষ্টরম্ভা! রোজগার করবার ক্ষমতা আছে? যে এ[illegible] সেই পেছিয়ে গেল, আর তাও ধরে করে যা রাজী করানা[illegible] তোমার ছেলে ত তাদের ভাগিয়ে দিলে—।"

বুড়ি মার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সেই অনুপস্থি[illegible] অপরিচিতার ওপর—"সে নচ্ছার মাগী যে গুণ করে[illegible] ওকে—"

ঘুরে বেড়াত বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর মত—[illegible] কাজ, না লক্ষ্য!

এমনি বেয়াড়া গড়ন হয় বটে দু'একটা মানুষে[illegible] সংসারের কোন খোপেই খাপ খায় না।

খোপ নইলে কি মানুষের চলে!

তাই বসত হয় ত গিয়ে একবার নিজের বৌদি[illegible] কাছে। খানিক-বাদে উঠে যেতে হত।—ছোট বৌ[illegible] একটা খাম এনে হয়ত বলত, "দাও না ভাই ঠিকা[illegible]

লিখে ইংরিজিতে,"—একটু মুখ টিপে হেসে বলত, "তোমরা বেটাছেলে, তোমরা না লিখে দিলে আমরা যাই কোথায় বলত ?"

আরো সাধ্য সাধনা করে বলত, "না হয়—বাংলাতেই দাও ভাল করে লিখে— !"

মেজ-বৌদি আর চাপ্‌তে না পেরে খিল খিল্ করে হেসে উঠত।

... ...

সমবয়সীদের মজলিশে গিয়ে বসত—একটি পাশে সঙ্কুচিত ভাবে।

সেখানে তখন আলাপ চলেছে হয়ত—ওই বয়সে যেমন আলাপ চলে— !

"......তা নয়। মেয়েদের ধরা দিতে নেই; ধরা দিলেই ওরা পেয়ে বসে"......উদ্গ্রীব হয়ে গণেশ কাণ খাড়া করে থাকত।

"...থেকে থেকে ঘা দিতে হয়, ওদের মজাই এই যে-দিকে ঘা খায় সেই দিকেই লতিয়ে পড়ে..."

রুদ্ধদ্বার কোন রহস্য-পুরীর নিষিদ্ধ গোপন সংবাদ! শুনতে যেন তার ভয় হ'ত।

"তা কি বলা যায়! কাউকে ঝড়ের মত ছিনিয়ে নিতে হয়, কাউকে বা অনেক সাধ্য-সাধনা করে অতি সন্তর্পণে জয় করতে হয়..... ."

এক জন গণেশকে দেখিয়ে দিয়ে বলত, "কি রকম হাঁ করে শুনছে দেখ্ !"

"আরে গণেশ যে, এতক্ষণ বলতে হয়! কত বেয়াদবী করে ফেল্লাম !"

গণেশ সকলের হাসিতে লজ্জিত ভাবে যোগ দেবার চেষ্টা করত।

"না না সে কি হয়, তোমায় কিছু বলতেই হবে !" —টানা-হেঁচড়া করে তারা গণেশকে নাস্তানাবুদ করে তুলত।

"প্রেম সম্বন্ধে ছোট একটু বক্তৃতা হলেই চলবে! নাও ওঠ দাঁড়াও!"

অনেক পরে অত্যন্ত নাকাল হয়ে ছাড়া পেয়ে সে বেরিয়ে যেত! আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, হয়ত অনেক অস্ফুট জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করবারও চেষ্টা করত।

তার পর হঠাৎ একদিন বৌদিদির সঙ্গে পরিচয়।

দুপুরবেলা হলেও মেঘলা দেখে গণেশ তার নিত্য নিয়মিত টহলদারীতে বেরিয়েছিল এবং সম্প্রতি যে পল্লীতে তখন এসে পড়েছিল পদমর্য্যাদা যে তার অত্যন্ত অল্প, তা তার পথ থেকেই মালুম পাওয়া যাচ্ছিল। যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি কর্দ্দমাক্ত গলিপথটি কোন রকমে যেন এঁকে বেঁকে দুয়ে সঙ্কুচিত হয়ে সেই ঘন-সন্নিবিষ্ট পল্লীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে!

হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে কাদা বাঁচিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে গণেশ গলি-পথ পার হচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

"শুনুন্ !"—স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর! কিন্তু সঙ্কোচের আভাষ মাত্র নেই তাতে।

গণেশ ফিরে তাকাল।

ছোট একটি টিনের চাল-দেওয়া মাটির দু-কামরা বাড়ি। তারই টিনের দরজাটি ঈষৎ ফাঁক করে একটি কালো বছর-কুড়ির মেয়ে মুখ বার করে দাঁড়িয়ে ছিল; গণেশকে ফিরতে দেখে আর একবার অত্যন্ত স্পষ্টস্বরে ডাকলে, "শুনুন !"

গণেশ বিস্মিত ভীত ভাবে এগিয়ে গিলে বল্লে, "আমায়— ?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কাছ থেকে একজন ভালো ডাক্তার ডেকে আনতে পারেন ?"

গণেশ তখনও বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে—। মেয়েটি তখন স্বল্পকটি কথায় যা বুঝিয়ে দিলে তার মর্ম্ম এই যে,

তারা সম্প্রতি দু-তিন দিন এই নতুন পল্লীতে উঠে এসেছে, কাউকে চেনে না; স্বামী তার এখন আফিসে গেছেন। হঠাৎ ছোট মেয়েটির কয়েকবার ভেদ বমি ইত্যাদি হয়ে কেমন-যেন কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই উপায়ান্তর না দেখে তাকে এই পথের লোকের শরণাগত হতে হয়েছে।

গণেশ ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেল।

ডাক্তার এলেন, ব্যবস্থাও দিয়ে গেলেন।

মেয়েটি বল্লে, "তা হলে বরফ আর ওষুধটা তাড়াতাড়ি আনুন গিয়ে—কেমন! দেখবেন দেরী না হয়।"

গণেশ আবার দৌড়োল।

ফিরে আসতে মেয়েটি বল্লে, "বরফটা ভাল করে কম্বলে জড়িয়ে এক কাজ করুন দেখি, রাস্তার কলে জল যদি এসে থাকে ওই বাল্‌তি করে এক বাল্‌তি জল এনে দিন্ ত! এ পোড়ার বাড়িতে আবার কল নেই।"

গণেশ জল নিয়ে এল। "এই যাঃ, ওটা যে ফুটো বাল্‌তি। আমি কি ওটাতে আনতে বল্লুম! নিন্ ঢেলে ফেলুন তাড়াতাড়ি ওই কলসিটায়! আর এক বাল্‌তি হলেই হবে।"

গণেশ বাল্‌তি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

... ...

ছুটি পেল যখন—তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কাপড় গুটিয়ে নেবার কথা আর তার মনে ছিল না; গলির কাদায় খুঁটটা লুটোতে লুটোতে' চলেছিল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার এমন ব্যতিক্রম তার জীবনে কখন ঘটেনি। এমন অদ্ভুত মেয়েই বা কে কোথায় দেখেছে।

মেয়েটির বাঁ ভুরুর ওপর একটি ছোট কাটার দাগ আছে না?

ছোট্ট কাটার দাগ—খুব ছোট্ট, বলতে গেলে চোখেই পড়ে না।

কি আশ্চর্য্য! অত ছোট কাটার দাগ তার নজরেই পড়ল কি করে!

আবার মুখটা মনে করতে গেলে শুধু কাটাটুকুই মনে পড়ে!

দশ বছর আগেকার কথা।

কলেরাই হোক্ আর যাই হোক্ ছোট মেয়েটি সেরে উঠল।

গণেশ খবর নিতে যায়।

চারু ভুরু পাকিয়ে বিরক্তির স্বরে বলে, "আচ্ছা বেয়াদব লোক ত' বটে! খবর নেওয়া যে আর শেষ হয় না। একদিন উপকার করেছে বলে বছর ভোর লোককে দিক্ করতে হয় নাকি।"

"চুপ কর, শুনতে পাবে!" শচী দরজা খুলে দেয়, বলে, "এসো ঠাকুর-পো!"

মাথাটা অনেকখানি নুইয়ে দরজা দিয়ে গলে এসে গণেশ একটু অকারণে হাসে। অত্যন্ত অশোভন দেখায়!

নিজেই শুধু-রকটার ওপর বসে পড়ে বলে, "খুকি ভাল আছে?"

চারু কিছু বলবার আগেই শচী বলে, "হ্যাঁ ভালো আছে।"

আর কথা কইবার কিছু পায় না। চুপ করে বসে থাকাটাও অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হয়। ওঠাও যায় না অথচ। অকারণে নিজের বৃহৎ কদাকার সৌষ্ঠবহীন হাত পা গুলোর দিকে তাকায়; কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করছে।

চারু ক্যাম্বিশের জুতোতে খড়ি লাগাতে লাগাতে অলক্ষ্যে ভ্রুকুটি করে।

শচীই কথা পাড়ে, বলে, "ডাক্তারটি ভাল, কেমন ঠাকুর-পো?"

ঠাকুর পো সম্পর্কটি আলাপের দ্বিতীয় দিন থেকে সে নিজেই পাতিয়েছে।

গণেশের মুখচোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, উল্লসিত হয়ে বলে, "নিশ্চয়ই ভাল, কি রকম চট্ করে সারিয়ে দিলে! আমি প্রথমেই দেখেছিলাম কিনা, কাঠের সাইন-বোর্ড ত নয়, একেবারে শ্বেত পাথরে কালো কালিতে খোদাই করা!"

চারু বলে, "আর একটু খুঁজে পেতে পেতলের পাতের সাইনবোর্ড দেখে যদি আন্‌তে—"

গণেশ কিছুই সন্দেহ করে না। সরল ভাবে বলে, "তখন যে তাড়াতাড়ি!"

শচী মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে। চারু রূঢ় ভাবে তার মুখের সামনে হো হো করে হেসে ওঠে।

নির্বোধের মত গণেশ সবার মুখের দিকে তাকায়।

শচী স্বামীকে চোখ দিয়ে ইসারা করে বলে, "কি মিছিমিছি হাস বলত?"

... ...

খানিক বাদে গণেশ চলে যায়।

চারু বল্লে, "ফের কাল খবর নিতে এলে অপমান করে দেব।"

•

কিন্তু গণেশ আসে যায়। অপমান করা আর হয় না। পালেদের সংসারে সে বেশ সয়ে গেছে।

আজকাল সকালে আসে বিকালেও আসে। শচী হয়ত বলে, "যাও ত ঠাকুরপো, ও ধোপানি-বেটি মরল কি বাঁচল একবার খবর নিয়ে এসত!"

গণেশের কিছুতে বিরক্তি নেই।

চারু চুপ করেই থাকে। আড়ালে মাঝে মাঝে বলে, "আচ্ছা বেকুব—।"

শচী সেকথায় কান দেয় না।

নিয়মিতভাবে সকাল বিকাল গণেশ হাজিরা দেয়। ঝড় হোক্ বৃষ্টি হোক্ বজ্রাঘাত হোক্ তার কামাই নেই। কাজ না থাকলে দেখা যায় রান্নাঘরের পাশের নির্দ্দিষ্ট খুঁটিটিতে ঠেশন্ দিয়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে সে ঠিক বসে আছে।

সময় থাকলে বৌদির সঙ্গে গল্প করে—

"চাকরী ছেড়ে দেব বৌদি! অমন গোলামির চেয়ে পানের দোকান করা ভাল।" ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বৌদি চুপ করে শোনে।

"হাজার হলেও এ হ'ল নিজের স্বাধীন ব্যবসা! যখন খুসী আসব যখন খুসী যাব কেউ কিছু বলবার নেই! কি বল বৌদি?"

বিদ্রোহী খোকার জীভ্‌টা ঝিনুক দিয়ে চেপে গলায় দুধ ঢেলে দিতে দিতে বৌদি বলে, "কেন? দেরী হয় বলে সাহেব কিছু বলেছে নাকি?"

গণেশ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, "না না বলবে কেন, বলবে আবার কে?" খানিক থেমে বলে, "এ ত আর মিস্ত্রী পায়নি যে ধমকে দেবে, গালাগাল করবে।"

"মিস্ত্রীদের বুঝি গালমন্দ করে—?"

"করে না আবার! চড় মেরে পর্য্যন্ত দেয়!"

বৌদি বলে, "মাগো কি ঘেন্না! তুমি ও কাজ ছেড়ে দাও ঠাকুরপো! পানের দোকান করলে চলবে ত?"

ধরা পড়ল কিনা অতশত গণেশ বোঝে না। বৌদির সহানুভূতিটুকু পেয়েই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলে, "খুব চলবে! তুমি দেখনা আমি শীগ্‌গীরই কাজ ছেড়ে দিচ্ছি! তোমাদের সঙ্গে চেনা হওয়া ইস্তক কাজে ঢুকেছি—দশবছর ত হ'ল, আর কেন? কি বল বৌদি!"

"তা বইকি দাদা, দোকান করে ঘরে একটি বউ আন, আমরা একদিন লুচি খাই।"

হেসে ফেলে গণেশ বলে, "লুচি আমি অমনিই খাইয়ে দেব।"

দশ বছর পরে এমন কেলেঙ্কারী যে করে বসবে কে জান্‌তে—?

বিকাল থেকে আয়োজন—গণেশ খাওয়াবে।

সন্ধ্যা হতে না হ'তে এক চেঙাড়ি বাজার এনে ফেলে গণেশ বল্লে, "নাও বৌদি ধর।"

ছেলে-পুলে গুলোকে কে শিখিয়ে দিয়েছিল কে জানে, তারা মুখস্থ আওড়াতে লাগল,—"শুধু বাজার আনলে ত হবে না কাকা; একটা কাকিমা নিয়ে এস মা অত রাঁধতে পারবে না!"

শচী কৃত্রিম রাগে ধমক দিয়ে বল্লে, "চুপ চুপ সব ফাজিল কোথাকার! কাকিমা অমনি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কিনা! বল্লেই গিয়ে নিয়ে আসবে!"

মেজ-মেয়েটা বোকা। বলে ফেল্লে, "তুমিই ত শিখিয়ে দিলে!"

রসিকতাটুকু গণেশের বোধগম্য হল। হাসি তার আর থামে না; বল্লে, "বেশ, যাহোক্! নিজে শিখিয়ে দিয়ে আবার ধমকান হচ্ছে!"

সন্ধ্যাটা এমনি করে বড় ফুর্ত্তিতেই গেল।

রান্নাঘর থেকে শচী ডাক্‌লে, "অমন বসে থাকলে চলবে না ঠাকুরপো! লুচি গুলো এসে বেলো দেখি।"

গণেশ গিয়ে লুচি বেলতে বস্‌ল।

অনভ্যস্ত হাতের শাসন কি লুচিগুলি মান্‌তে চায়! অদ্ভুত আকার হতে লাগ্‌ল।

"ওমা! ওই তোমার লুচি বেলার ছিরি! বেলুনটা ধরতে পর্য্যন্ত জানো না! সরো সরো—দেখিয়ে দি।"

অপ্রশস্ত ছোট রান্নাঘর! গণেশ একটু সরে বসল, বৌদি পাশেই চাকি-বেলুন নিয়ে লুচি-বেলা শেখাতে বসে পড়ল।

জায়গা নেই, গায়ে গা ঠেকছিল। শচীর হাস্যোজ্জল মুখের একটা দিক উনুনের আঁচের আভায় লালচে দেখাচ্ছিল। লুচি বেলার সঙ্গে সঙ্গে কাণের পার্শি-মাকড়ির ভেতরের তারা স্বল্পালোকে চিকৃচিক করছিল।

কিসে কি হ'ল বলা যায় না,—গণেশের মনে হচ্ছিল কি এক অপরিচিত তীব্র অনুভূতিতে তার সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছে।—কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানও বোধ হয় তার ছিল না।

শচী বলছিল, "এই বেলা শিখে নাও, কালো কুচ্ছিৎ বলে আমাদের কাছে যা চল্‌ল, সুন্দর-বৌ এলে ত আর তা চলবে না, তখন সুন্দর করে বেলতেই হবে।"

নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘর!—শচীর চুড়িগুলি শুধু হাতের দোলায় মৃদু ভাবে বাজছিল রিন্‌ ঠিন্‌! অত্যন্ত নিকটে মাথার খোঁপা থেকে কি একটা অস্পষ্ট গন্ধ আসছিল। মনে হচ্ছিল দেহের স্পর্শটি যেন তরল সুরার মত সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ গণেশ দীর্ঘ কদাকার বাহু দিয়ে শচীকে সবলে বুকের ভেতর টেনে চেপে ধরল।

ব্যাপারটা অত্যন্ত আকস্মিক! শচী কিছুক্ষণ তার আলিঙ্গনের মাঝে নিস্পন্দভাবে হতভম্বের মত চেয়ে রইল। তারপর তার মুখটা দুহাতে সবলে ঠেলে দিয়ে মুক্ত হয়ে, সজোরে বেলুনটা তার কপালে বসিয়ে দিলে।

"তবে রে হতচ্ছাড়া, তোমার পেটে পেটে এই বিদ্যে! বেরোও এখান থেকে—এক্ষুনি বেরোও!"

ভীত অসহায় পশুর মত কাতর ভাবে গণেশ চারিদিকে চাইছিল। স্বাভাবিক জ্ঞান তার এতক্ষণে ফিরে এসেছিল বোধহয়।

শচী কিন্তু রাগে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। বেলুনটা দিয়ে আর-এক ঘা সে গণেশের মাথায় কসিয়ে দিয়ে চীৎকার করে বল্লে, "এত বড় তোমার আস্পর্দ্ধা, বেরোও বলছি এক্ষুনি—।"

চারু ব্যাপারটাকে আরো কুৎসিত করে তুল্‌ল।

বহুকালের বিদ্বেষ তার জমা হয়েছিল বোধ হয়। মেরে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েও তার হ'ল না, খাবারের যাকিছু আয়োজন সে করেছিল, সেগুলো পর্য্যন্ত তার

পেছনে রাস্তায় টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে একটা অত্যন্ত কুৎসিত গালি দিয়ে বল্লে, "নিকালো—"

তারপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে।

দশবছরের একনিষ্ঠ পূজার কোন মূল্যই তারা দিলে না।

রাস্তায় পর্য্যাপ্ত লোক জড় হয়ে গেছল। ব্যাপারটা সবাই একরকম বা আর-একরকম বুঝল। শুধু যাকে নিয়ে এতকাণ্ড সেই নির্বোধই সমস্ত মার ধোর গালাগাল নীরবে সয়ে হতভম্ব হয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।—

সকাল বিকেল আর কাটতে চায় না।

তবু বেরিয়ে যেতে হয়। বাড়িতে থাকলে সবাই যেন সন্দেহের চোখে দেখে। সময় কাটানো গণেশের দায় হয়ে ওঠে।

আগেকার মত ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগেনা। মাঠে গিয়ে চুপ করে বেঞ্চির ওপর বসে থাকে; কারখানায় বাড়্তি খাটুনি খাটে!

বৌদিরা বাড়িতে হেসে বলে,—"জামাটা যে উল্টো হয়েছে ঠাকুরপো!"

তাড়াতাড়ি জামাটা ঘুরিয়ে পরে গণেশ বেরিয়ে যায়! বুকের বোতাম ছুটো ছিঁড়ে গেছে—লাগান আর হয়ে ওঠে না। জীনের ছেঁড়া ময়লা কোটটা বুকের কাছে হাঁ করে থাকে।

মাসছুএক এমনি করেই গেল।

মাঠে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগেনা। উঠে আবার হাঁটতে সুরু করে।

সেত আর কারুর বাড়িতে যাচ্ছে না; অমনি পথ দিয়ে গেলে দোষ কি?

সকাল বিকেল পথ দিয়ে যায়—মাথা নীচু করে—কোন দিকে চাইতে পারেনা।

শচী দরজায় সওদা করতে করতে দেখতে পায়।

বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, "হাসছ কেন মা?"

"কিছুনা, অমনি।"

... ...

চারু ছেলে ছুটোকে ধমকায়—"কোথায় পেলি অত চীনেবাদাম লজঞ্চুষ?—বল্ কোথা থেকে পয়সা চুরি করেছিস্?"

ছেলেগুলো কেঁদে ফেলে বলে, "পয়সা চুরি করিনি।"

"তবে কোথায় পেলি?"

ছেলে ছুটো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, ছোটটা বলে ফেলে, "কাকা কিনে দিলে,—"

বড় বলে, "বল্‌তে বারণ করে দিয়েছিল—"

চারু চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে, "ফেলে দে নর্দ্দমায়, এক্ষুণি ফেলে দে।"

ছেলেছুটো হতাশ হয়ে আরো জোরে কাঁদতে সুরু করে।

শচী এসে ছেলে ছুটোকে সরিয়ে দিয়ে বলে, "যা যা—খা গিয়ে যা, ফেলতে হবে না।"

চারু অত্যন্ত রেগে যায়, বলে, "ফেলতে হবে না কি রকম? পাজী, বদ্‌মাস্! তার এতবড় আস্পর্দ্ধা, এখনো আমার ছেলেদের খাবার কিনে দ্যায়? আর সেই খাবার তুমি ওদের খেতে বলো?"

শচী শুধু একটু হাসে।

সে হাসির অর্থ বোঝা শক্ত।

"যা খুশী করো"—চারু রেগে যায়, কথা কয়না।

... ...

ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে খাওয়াতে শচী বলে, "আনারসের চাটনি তোদের কাকা বড় ভালবাসে রে।"

ছোট মেয়েটা বড় বেশী ন্যাওটো ছিল। চোখ ছুটো তার ছল ছল করে ওঠে, বলে, "কাকাকে বাবা মেরেছে, কাকা আসবে না।"

শচী বলে, "নারে, দেখিস্ আসবেখন্।"

চারু সব শোনে। খানিক শচীর দিকে চেয়ে থাকে, তারপর তিক্তকণ্ঠে বলে, "তোমার কি লজ্জা নেই?—না সব ভুলে গেছ?"

তবুও শচী শুধু একটু হাসে—দুর্বোধ হাসি।

দরজাটা ঈষৎ খোলা। ফাঁক দিয়ে পথ দেখা যায়।

শচী বল্লে,—"ডাক্ ডাক্! বড়-খোকা! তোর কাকাকে ডাক্!"

বড় খোকাকে আর দুবার বলতে হ'ল না—সে ততক্ষণ ছুটে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু খানিক বাদে মুখ কালো করে ফিরে এসে বল্লে, "কাকা আসবে না মা।"

"আসবেনা কিরে? বলগে যা—মা ডিমের বড়া ভেজেছে, খেতে ডাকছে, না এলে রাগ করবে।"

বড়খোকা আবার গেল।

এবার গণেশ এল। বড়খোকার পেছনে ফাঁসির আসামীর মত অত্যন্ত ভীত সঙ্কুচিত ভাবে এসে দাওয়ার কোলেই বসে পড়ল মাথা নীচু করে। মাথা আর সে তুলতেই পারে না।

ছোট মেয়েটা কোলের ওপর পড়ে চুল টেনে মুখ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন আসনি কেন?"

"তোর কাকা যে বিয়ে করতে গেছল, তাই আসেনি!"

ছোট মেয়েটা জিজ্ঞাসা করলে, "বৌ কোথায় তাহলে?"

শচী হেসে বল্লে, "তোর কাকা যা তালগাছ, ট্যাঁকেই গুঁজে এনেছে বোধ হয়—দেখ্!"

গণেশ হেসে ফেল্‌ল। ছেলে-মেয়েগুলো হাসাহাসি করে ছুটোপাটি লাগিয়ে দিলে, "কই দেখি কাকার ট্যাঁক—"

... ...

এমনি করে হাসি-তামাসা চলে। গণেশ মুখ তোলে, তারপর হেসে কথা পর্য্যন্ত কয়। শচী সমস্ত সঙ্কোচ, সব লজ্জা কেমন করে যেন উড়িয়ে দেয়।

... ...

চারু যখন এল তখন রীতিমত উৎসব সুরু হয়ে গেছে। গণেশ খেতে বসেছে এবং তাকে ঘিরে বসে ছেলে-মেয়েরা চীৎকার করছে।

শচী পরিবেশন করছিল।

চারু কোন দিকে না চেয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে।

ছেলেদের হট্টগোল থেমে গেল—তবু গণেশ কিছুই দেখেনি।

সে তখন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নির্বিষ্টমনে খেয়েই চলেছে।

শচী হাসছিল, হাতের থালা থেকে সমস্ত বড়াগুলো তার পাতে নামিয়ে দিয়ে বল্লে, "আর আন্‌ব ঠাকুরপো?"

"আন্‌বেনা? তুমি যত পার আন না; আমি খাবনা বলেছি?"—গণেশের আজ উল্লাসের সীমা ছিল না। আবার এ-বাড়িতে ঢুকতে পাবে সে যে আশা করতে পারে নি!

ঘরের ভেতর চারুর এই নির্ব্বোধ মূর্খের হাসি অসহ্য হয়ে উঠছিল।

শচী আর এক থাল বড়া এনে পাতে ঢেলে দিলে, হেসে বল্লে, "দেখ, হবে ত?"

গণেশের তখন মাত্রাজ্ঞান কি আর আছে? বল্লে, "উঁহুঃ—" এবং সেগুলো অতি কষ্টে নিঃশেষ করে বল্লে, "আর কই বৌদি!"

অতিভোজন দিয়েই সে আজ বৌদিকে সন্তুষ্ট করবে!

রান্নাঘর থেকে বড় মেয়ে বল্লে, "আর ত বড়া নেই মা!"

ছোট মেয়েটা শুনে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "আমরা কি খাব কাকা? তুমি যে সব খেয়ে ফেল্লে!"

অতিভোজনের বাহাদুরীর চেষ্টার এমন পরিণতি হতে পারে তা গণেশের ধারণা হয়নি। হঠাৎ লজ্জাকর অবস্থাটা ভাল করে উপলব্ধি করে তার মুখটি একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

অত্যন্ত কাতর হতাশদৃষ্টি বৌদির পানে তুলে সে বল্লে, "তুমি কেন বলে দিলেনা বৌদি?"

মনে হ'ল এ অপরাধের মার্জ্জনা সে আর আশা করে না।

শচী হাসছিল, বল্লে, "দূর পাগল কোথাকার, তাতে কি হয়েছে!"

ঘর থেকে সে হাসি চারু দেখতে পেল। সে হাসির মানেও যেন কিছু বোঝা গেল। এবং কেমন করে বলা যায় না তার মনে হ'ল মনের সমস্ত গ্লানি বিদ্বেষ যেন তার একেবারে কেটে গেছে!

সংগ্রহ

বনস্পতির মৃত্যু

ওয়াদিশ্‌লা রেমণ্ট্

হ্যাঁ গা, ওঠ না! মদ খেয়ে মড়ার মত পড়ে আছ! আর আমি বাঁদীর মত খেটে খেটে মরি! পোড়া কাজেরও কামাই নেই। র‍্যাফেল এই এল বলে'! সে এসে বাঁধা-গোছায় আমার সঙ্গে হাত লাগাবে'খন। একবার ওঠ না—হ্যাঁ গা—

স্বামী মদ খাইয়া বেহুঁস অবস্থায় খড়ের গাদায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। স্ত্রী আসিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দূর হ মাগী—

এবার স্বামীটি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

মাগো! কি করি। জিনিষ-পত্তর সব বাইরে টেনে আনতে হবে, তা না হলে গাড়ী বোঝাই হবে কি করে? এখনও ময়দাগুলো বস্তায় তোলা হয় নি—আলুগুলো ভাঁড়ার থেকে বের করতে হবে! মাগো, কি হবে? কত কাজ পড়ে রয়েছে! পোড়া পায়েও আর জোর পাই না! উনি কোথায় আমাকে একটু সাহায্য করবেন, না পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন!

বিফল মনোরথ হইয়া স্ত্রী আরো সজোরে ও ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, উঠলে না? ভাল হবে না বলছি!

স্বামী তেমনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে অলসভাবে উত্তর করিল, দূর হয়ে যা আমার কাছ থেকে—

তারপর উপুড় হইয়া খড়ে মুখ গুজিয়া অসাড় হইয়া রহিল। স্ত্রীর অশ্রু ও মিনতি বিফল হইয়া গেল।

স্ত্রী ঘরের আসবাব-পত্র বাহিরে টানিয়া আনিয়া দেওয়ালের ধারে গোছাইয়া রাখিতেছিল। একটা দেব-

মূর্ত্তির ছবি সযত্নে কাগজে মুড়িতে মুড়িতে সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল, হায় রে পোড়া কপাল! সেই ছেলেবেলায় কবে বাপ-মা'র কোল হারিয়েছি। আর আজ ভিখারিণীর মত ঘরদোর ছেড়ে কোথায় চলেছি—আর এই-কি সময় ঘর ছাড়বার? এই দারুণ দুর্য্যোগে মানুষ যে কুকুরটাকেও দূর করে দিতে পারে না। হতভাগী চাষার মেয়ে, কেই-বা তাকে দেখে!

উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে বনের ধারে কর্দ্দমাক্ত পথের দিকে চাহিল। বনে তখন গাছ কাটা সুরু হইয়াছে। র‍্যাফেল না আসিলে কেই-বা তাহার জিনিষ-পত্র গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দিবে? সে আর-একবার পথের দিকে তাকাইল। কিন্তু পথে কোনও মানুষের দিশা নাই—শুধু জমাট কুয়াশা আর ঘোলাটে পুকুর চোখে পড়ে।

উঠান হইতে সে একবার তাহার পরিচিত কুটীর-খানির দিকে চাহিল। দীর্ঘশ্বাসে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তারপর ধীরে-ধীরে সে ঘরের পিছনে গরুটাকে দেখিতে চলিল।

ইহারই মধ্যে সে ঘরের সামনে জিনিষ-পত্র অনেক টানিয়া বাহির করিয়াছে,—একখানা মই, একটা হলদে রঙের ফুলের সাজি, দু'একটা লাল ফুলও তার মধ্যে আছে, কতকগুলো ভাঙ্গা চেয়ার, একটুকরো নীল টেবিল-ঢাকা কাপড়, দু'একটা বেঞ্চি, একটা ছোট টেবিল, টেবিলটার উপরে মাল্যবিভূষিত একটি ক্রশ, কতকগুলো ফুল, দু'এক পোঁটলা আলু, খড়ের ছুটো বিছানা—এই সমস্ত এলোমেলো জিনিষের মাঝখানে মাটির উপরে একটি বৃহদায়তন কৃষ্ণবর্ণের শূকর শুইয়া আছে, শূকরটার পা গাছের সঙ্গে বাঁধা।

গরুটিকে আদর করিতে করিতে সে ডাকিল, ও আমার সুবলা! সুবলা!

সুবলা গলাটি বাড়াইয়া দিয়া পালয়িত্রীর উন্মুক্ত অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি সুবলার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর সামনে মুরগীগুলার তদারকে গেল।

মুরগীগুলোকে এক জায়গায় জড় করিবার জন্য প্রথমে সে এক মুঠা কড়াই ছড়াইয়া দিল। তারপর একে-একে ডানা বাঁধিয়া তাহাদের ঝুড়িতে পুরিল।

আবার সে ফিরিয়া পথের দিকে চায়···

গ্রামের দিক হইতে একটি বালিকার রেখা-মূর্ত্তি সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হইল।

জোর-গলায় মা ডাকিল, ছুটে আয়—ছুটে আয় রাক্ষুসী!

মেয়েটির পায়ে কিছু ছিল না; সারা গা এমন ভাবে ঢাকা যে, শুধু তাহার মুখের একটুখানি মাত্র দেখা যায়। মুখখানি শীতার্ত্ত ও মলিন।

তাড়াতাড়ি সে মায়ের সম্মুখে বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে একবোতল ব্রাণ্ডী, কয়েকখানা রুটি ও একটা মাংসের কৌটা বাহির করিয়া দিল।

এতক্ষণ কোথায় ছিলি, রাক্ষুসী! বলি, আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল কোথায়?

বটে! কি রকম জোরে বৃষ্টি নেমে এল দেখ্‌লে না? আমি কুকুরের মত ছুটে ছুটে আসছি,—উনি বলেন কি না আড্ডা!

শীতে মেয়েটির হাত-পা কালো হইয়া গিয়াছিল। সে জোরে জোরে হাত-পা ঘষিতে লাগিল।

আড্ডা দিয়ে আসা হল—আবার কথা!

বলিয়াই মাতা কন্যার পৃষ্ঠদেশে যথোচিত পুরস্কার বর্ষণ করিল।

ক্ষুব্ধ হইয়া মেয়েটি উনানের একপাশে গা-হাত-পা গরম করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। উনানে তখনও দুই-একটি কয়লা লাল হইয়া জ্বলিতেছে।

ও-ধারে মা আবার ঘরের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘরের আর-সব আস্‌বাব-পত্র সে একে-একে বাহিরে আনিয়া ফেলিল। ঘরের সাম্‌নের একটা খোলা জায়গা পার হইয়া কয়েক-গাছি তৃণগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া সে সুবলার

মুখে দিল। তাহার পর উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল সে দুই হাতে মুছিয়া ফেলিল।

সহসা সে থামিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে মাথা চাপিয়া বলে, হা ভগবান! হা ভগবান!

ভয়ে ও বেদনায় তাহার অন্তর ঘন ঘন দুলিয়া উঠে। সে ভাবিয়া পায় না—কেমন করিয়া এত দিনের এই ভিটে-মাটি আজ সে ছাড়িয়া যাইবে····

স্বামীটি তখনও শুইয়া ছিল, তবে সে মাঝে-মাঝে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল। আর আরক্তিম চক্ষু দুইটি রগড়াইয়া আরও আরক্তিম করিতেছিল। এত জোরে তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছিল যে, তাহার কুকুরটি ছুটিয়া তাহার পাশে আসিয়া জামা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন প্রভুর মন ফিরাইতে পারিল না তখন সে ধীরে ধীরে উনানের ধারে প্রভু-কন্যার পাশে শুইয়া জলন্ত কয়লাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

র‍্যাফেল যখন দুটি মুমূর্ষু ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ী লইয়া আসিল তখন রাত্রির ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে।

তিনিই মঙ্গলময়!—বলিয়া র‍্যাফেল বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

স্বামী শয্যা হইতে উঠিয়া অভিবাদন করিল,—তিনিই মঙ্গলময়—যুগ হতে যুগ···! এসেছ ভাই, ধন্যবাদ!

ওসব কিছু নয়! তবে বাইরে দুরন্ত বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তা ঘাট তো কাদায় ভরে গেছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া বইছে।

তা—আমাদের যদি ভোর বেলা গাঁয়ে পৌছোতে হয় তা হ'লে এখনই রওনা দিতে হয়।

র‍্যাফেল ঘরের এককোণে ছড়িটি রাখিয়া একবার দুই হাত বেশ করিয়া ঘষিয়া লইল, তারপর উনানের কাছে গিয়া ফুঁ দিয়া ছাই উড়াইয়া এক টুকরো জলন্ত কয়লা নিভে-যাওয়া পাইপে ভরিয়া লইল। তখনও ঘরের মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুক পড়িয়া ছিল। র‍্যাফেল তাহার উপর বসিয়া পাইপ টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামিনী জানালার উপর রুটি, বোতল আর মাংস আনিয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা দুজনে খেয়ে নাও!

মাংস ও মদের গন্ধে স্বামী সজাগ হইয়া বলিল, তোমার এত কষ্ট করবার কি দরকার? এস র‍্যাফেল,—

তারপর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া গৃহস্বামী বলিল, তুমিও এস, একটু কিছু খেয়ে নাও,—

গৃহস্বামিনী পিছন ফিরিয়া আড়াল করিয়া সামান্য পান করিল। কৃষাণ দুইটি পুরামাত্রায় আহার করিতে লাগিল।

জমিদার এই বন বিক্রী করেছে শ্যাম্পেনের পয়সার জন্যে; আমাদের শ্যাম্পেন না জুটুক—ব্রাণ্ডীতেই চলবে। কি বল?

তা তো সত্যি। কিন্তু আজ থেকে আমাদের সবই কিনতে হবে—একটা ছড়ির দরকার হ'লে তাও কিনতে হবে।

র‍্যাফেল আপন-মনে আবার বলিয়া চলিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বনটা তার গাছপালা নিয়ে বেঁচে ছিল—ততক্ষণ কিসের ভয় ছিল? সুখে হোক, দুঃখে হোক, শুক্‌নো ডাল কুড়িয়ে আগুন জ্বালা তো যেতো, গাছে তো ফল ছিল—চাও তো দুটো-একটা পাখী কিংবা খরগোস মারো! আজ আর তা হবে না। বরাত, পোড়া বরাত!

যাক্, আর একবার গেলাস ভরে দাও। বুরেক্! আয় ব্যাটা কুকুর, এই মাংস খা। খুব আহ্লাদ, না—রে? তোর মনিব আজ বিশ বছরের নোক্‌রীর পর পথে দাঁড়াল—

কুকুরটি একবার বীভৎসভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, যেন সে তার মনিবের কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

গৃহস্বামিনী তখন দরজার উপর দেহের ভর দিয়া কাঁদিতেছিল।

র‍্যাফেল ধীরে-ধীরে বলিল, যাক্, একবারের বেশী তো আর মরতে হয় না! যার নৌকায় চলেছি, সে যদি না চায় তবে মাঝদরিয়াতেও নেমে যাওয়া ভাল!

পাইপটা ঠুকিয়া সেটাকে পরিষ্কার করিতে করিতে র‍্যাফেল বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর তাহারা সকলে মিলিয়া জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল। নীরবে, কেহ কাহারও দিকে চাহিল না। গোছানো শেষ হইলে র‍্যাফেল দড়ি দিয়া সব বাঁধিতে লাগিল। গৃহস্বামিনী তখন বাড়ীর ভিতর গিয়া গরুটিকে লইয়া আসিয়া মেয়ের উপর লইয়া যাইবার ভার দিল।

মেয়েটি বেশ করিয়া কাপড়ে গা-হাত-পা ঢাকিয়া গরুটিকে লইয়া পথে নামিল। ভাষাহীন জন্তুটি বাধা দিল। কুটীরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মেয়েটিকে ঘিরিয়া সে চীৎকার করিতে লাগিল। র‍্যাফেল ডাকিয়া বলিল, তা হ'লে এইবার চলি—

•

গৃহস্বামী উত্তর দিল, হাঁ চল।

তবুও সে একবার হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিল। তাহার পিছনে তাহার স্ত্রীও আসিল। তাহারা দুইজনে দুইজনার দিকে মৌন বিষাদে চাহিয়া রহিল। অকারণে মেঝের খড়গুলি একবার তুলিয়া ফেলিল— উদাসভাবে দেয়ালটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তটিকে কেমন করিয়া এড়ান যায়?

র‍্যাফেল ডাকিয়া বলিল, অন্ধকার ঘনায়ে আসে— চলে যাওয়া যাক্।

স্বামী স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বলিল, চলো—যাই— ভারী বিশ্রী এ-সব- তবে হয় ত আব্যর সব বদলে যাবে—

কথা শেষ করিয়া সে তার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া সজোরে পিছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তুমি ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজমান—তুমি পিতা, তুমি সন্তান, তুমি অধিদেবতা, তোমারই জয় হ'ক!

গৃহস্বামী ওভার-কোটটি গায়ে বেশ টান করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া পথে নামিয়া আসিল। পিছনে স্ত্রী তাহার শূকরটি টানিয়া লইয়া আসিতেছিল। চোখে অশ্রু!

গৃহস্বামী বনের ধারের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। পথের পাশে মৃত অরণ্যানীর কঙ্কালের মত রাশীকৃত কাষ্ঠ। তাহার সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এই বনের সে প্রত্যেক পায়ে-চলা পথটি চিনিত—এর প্রত্যেক গোপন কক্ষটি যে তাহার জানা ছিল। জীবনের সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া সে এই অরণ্যানীর সেবা করিয়াছে। সেবার অন্তরালে কখন্ অজ্ঞাতে সে এই বনানীর সহিত বাঁধা পড়িয়াছিল। দীর্ঘজীবন ধরিয়া ঐ লুপ্তপ্রায় বৃক্ষগুলি দিনের পর দিন ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুতের আঘাত নীরবে সহিয়া বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু আজ প্রমাণ হইয়া গেল যে, বজ্র আর বিদ্যুতের চেয়েও তীব্র লৌহের কুঠার। তাই আজ লৌহের আঘাতে বনানীর হৃদ্-স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। কাদায় চলিতে চলিতে সে একবার মজুরদের হাতের কুঠারের দিকে চায়, আর একবার কাঠ-ভরা গাড়ীগুলির দিকে চায়। চোখে তার হতাশ উন্মাদনা জাগিয়া উঠে। তাহার মনে হইতেছিল যে, লৌহের ঐ এক-একটি আঘাত তাহারই অঙ্গের উপরে পড়িয়াছে। লৌহ তাহার অন্তরাত্মাকে আঘাত করিয়াছে।

তাহার সাধ হয় চীৎকার করিয়া সে পৃথিবীর সকলকে এই বেদনার কথা জানায়, কিন্তু নিরুপায় হইয়া কোনও রকমে নিজেকে পড়িয়া যাওয়া হইতে বাঁচাইবার জন্য সে আবার দাঁতে দাত লাগাইয়া চলিতে সুরু করে।

ক্রমশ বৃষ্টিধারা আরও শীতল হইল। বর্ষা ভীষণতর হইয়া আসিল। পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত দুর্ব্বল শাখাশিশুর পীত-গৌরবের শেষ নিদর্শনপত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া রহিল;

অদূরে কোথাও নগ্ন দেওদার-বৃক্ষের পত্রপল্লবহীন চূড়ায় বসিয়া একপাল দাঁড়কাক চীৎকার করিয়া বিলাপ করিয়া উঠিল, হায়, আজ হতে নীড় বাঁধা হবে কোথায়!

গোধূলির ম্লান ছায়া আর মুমূর্ষু অরণ্যানীর নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সেই মৃত্যু-মলিন গোধূলি, ভয়াবহ অন্ধকার ও জ্বালা লইয়া কৃষকের অন্তরে প্রবেশ করিল। রাগে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, পথের ধারের ইটগুলিকে চিবাইয়া সে খাইয়া ফেলে। কিন্তু ভয়ে সে চোখ বুঁজিয়া চলিতে লাগিল, পাছে মর্ম্মন্তুদ আরও কিছু চোখে পড়ে।

জীবনে মৃত্যু তো শুধু একবার দেখা দেয়—বলিয়া সে সজোরে কতকগুলি শুক্‌নো ডালে লাথি মারিল। তারপর বিশ্রামের জন্য সে একটি ওক্ গাছের তলায় গিয়া বসিল। এই গাছটিতে লৌহের আঘাত এখনও পড়ে নাই, কেন না ইহার অঙ্গে দেব-মূর্ত্তি আছে। প্রতিদিন এই ওক্ গাছ পর্য্যন্ত সে বন পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিত। এই গাছটিই বনের শেষ সীমানা। এইখান হইতে প্রতিদিন সে ফিরিয়া ঘরে গিয়াছে—আজ এই পবিত্র বনাঙ্গন ছাড়িয়া সে চিরকালের তরে চলিল। একি নির্ব্বাসন! হায়, মৃত্যু যদি হয় যদি মৃত্যু হয়··· ···

কৃষাণ বেদনায় শিশুর মত ভাষাহীন ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

স্ত্রী ডাকিল, ওগো, চলে এসো শিগ্‌গির!

র‍্যাফেল যে আর দাঁড়াইতে পারে না! রাত্রিও গাঢ় হইয়া আসিল।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল, দূর হও—নইলে মেরে ফেলবো এখনই!

জালা-বোঝাই করে মদ খাওয়া হয়েছে; এখন বুঝি পথেই পড়ে থাকতে হবে?

চলে যাও, বলছি। নইলে ভাল হবে না।

তা হলে আমি যাই। তুমি রইলে।—বলিয়াই স্ত্রী ধীরে স্বামীর নিকটে গিয়া ক্রন্দন-স্ফীত আরক্তিম দুই চক্ষু তুলিয়া জামার হাতা ধরিয়া টানিয়া বলিল, এসো, এসো!

যাও, যাও বলছি, নইলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো। যাও—

স্ত্রী জামা আরও জোরে টানিল। কৃষক এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা শুক্‌না ডাল দিয়া স্ত্রীকে জোরে আঘাত করিয়া টানিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর নিজে সে শূকরের দড়িটি লইয়া পথ চলিতে লাগিল। স্ত্রী উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পিছু পিছু চলিল।

অচিরে অন্ধকারে আর নিশীথের কুয়াশায় তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু অন্ধকারে দাঁড়কাকের তীব্র আর্ত্তনাদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ক্বচিৎ দুই-একটি গরু মাঠ হইতে ঘরে ফিরিতেছিল। অন্ধকারে তাহাদের গলার ঘণ্টার শব্দ ও তাহার সহিত রাখাল-বালকের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

তারপর সমস্ত নীরব হইয়া আসিল। তিমির-গম্ভীর ধরণীকে মনে হইতেছিল যেন শুধু একটা গতিহীন, অন্ধ, মলিন, তনুহীন তরল অন্ধকারের পুঞ্জ...

মাঝে মাঝে শুধু সেই পুরাণো ওক্ গাছটি দুলিয়া দুলিয়া অন্ধকারে শুষ্ক পত্র ঝরাইতেছিল। মৃত্যু-মথিত অরণ্যানীর ব্যথিত অন্তর হইতে শুধু একটি নিরুদ্ধ মর্ম্মর ধ্বনি উঠিতেছে।

হায় মৃত অরণ্যানী, হায় মৃত অরণ্যানী!

অনুবাদক—শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৩

—— ——

গান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হার মানালে গো
ভাঙ্গিলে অভিমান।
নিজের হাতে জ্বালা,
পূজা-দীপের থালা,
হ'ল খান্ খান্॥
এবার তবে জ্বালো,
করুণ তারার আলো।
কর রঙীন ছায়ার
এই গোধূলি অবসান॥
ঘনায় যবে রাতি,
তখন তুমি আস,
আমার গোপন সাথী।
তাই ত দিনের পারে,
অন্ধকারের দ্বারে,
ক্লান্ত বীণার তারে,
এনেছি এই গান॥

স্বরলিপি

শ্রী রমা মজুমদার ও শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II ^নি^সা -া রা রা | সা -পা পা -ঋা I গা -া -া -া | -া -া -া গমা I
হা ০ র মা না ০ লে ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভা

রা -গা -গা -া | রা -া রা -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
ঙ্গি ০ লে ০ অ ০ ভি ০ মা ০ ০ ন ০ ০ ০ ০

{ সপা -া পা পা | পা -হ্মা পা -া I পা -হ্মা পা -া | -া -া -া -া I
নি ০ জে র হা ০ তে ০ জা ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

হ্মা -া পা -া | হ্মা -া পা হ্মা I গা -মা গা -া | া -া -গা -পা } I
পূ ০ জা ০ দী ০ পে র থা ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

গা -সা গা -া | গা -রা গা -া I সা -ন্‌া সা -সরা |
হ ০ ল ০ থা ন্‌ থা ন্‌ হা ০ য় ০

-রা -া -া -া . রা -সা -রা -গা | -া -া -া -া
০ ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

{ পা -া গা -া | পা -হ্মা ধা -পা I ধা -নির্সা র্সা -া | -া -া -া -া I
এ ০ বা র ত ০ বে ০ জা ০ লো ০ ০ ০ ০ ০

র্সা -া র্সা র্গা | র্রা -া -া -া I নির্সা -র্সা -না -র্সা | ধা -র্সা না -া } I
ক ০ রু ণ তা ০ ০ ০ রা ০ ০ র আ ০ লো ০

(-না -ধা -পা -া) | পা -হ্মা পা -া I পা -হ্মা পা -না |
০ ০ ০ ০ ক ০ র ০ র ০ ভী ন্‌

ধা -া পা -া I পা -হ্মা পা -না | ধা -পা পা -হ্মা I গা -মা মা -া I
ছা ০ য়া র এ ০ ই গো ধূ ০ লি ০ অ ০ ব ০

গা -া -া -া I সা -ন্‌া রা -া -া -া -া -া I রা -সা -রা -গা | -া -া -া -া II
সা ০ ০ ন্‌ হা ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

II { সা -পা পা পা | হ্মা -া গা -সা I গা -রা সা -া | -া -া -া -া I
ঘ ০ না য় য ০ বে ০ রা ০ তি ০ ০ ০ ০ ০

সা -ন্‌া সা -রা | রা -া রা -া I রা -সা সা -গা | গা -া গা মা I
ত ০ খ ন তু ০ মি ০ আ ০ স ০ আ ০ মা র

রা -গা গা -রা | রা -া সা -া } I { পা -া গা গা | পা -হ্মা ধা পা I
গো ০ প ন সা ০ থী ০ তা ০ ই ত দি ০ নে র

ধা -া সা ০ | -া -া -া -া I র্সা -া -া র্গা | র্রা -া -া না I
পা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ অ ০ ন্‌ ধ কা ০ ০ ০

র্সা -া -া -া | -া -া -া না I ধা -র্সা না -া | -না -ধা -পা -া } I
রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র দ্বা ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

পা -হ্মা -র্সা র্সা | ধা -া পা -হ্মা I ধপা -হ্মা গা -া | -া -া -া -া
ক্লা ॰ ন্ ত বী ॰ ণা র তা ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

গা -হ্মা পা -না | ধা -া পা হ্মা I গা -া -া -া | -া -া -া -া I
এ ॰ নে ॰ ছি ॰ এ ই গা ॰ ॰ ন্ ॰ ॰ ॰ ॰

সা ন্া রা -া | -া -া -া -া | রা -মা -রা -গা -া -া -া -া II
হা ॰ য় ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ হা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ য়

পাঁক

(দ্বিতীয় পর্ব্ব—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

তারপর আবার তিনটে বাজতে না বাজতে সরকারী কলের চারি ধারে জটলা স্থরু হয়।

প্রথমেই আসে পেসাদী! মাথার চারিধারের চুল উঠে গিয়ে ব্রহ্মতালুর কাছে ক'গাছি মাত্র অবশিষ্ট আছে। দেখায় যেন ঠিক ঝোড়ো-কাকটি। ষোল বছর বয়স হলে কি হবে, মেয়েটা যেন বেরুষ কাঠ! চোখগুলো কোটরে সেঁধুন, মুখখানা সাদা হাঁস হাঁস করছে; গলাটি নয় যেন পাকা আমের বোঁটাটি; কখন মাথাটি ছিঁড়ে পড়ে!

চিঁচিঁ করে বলে, "রোগে এমন করেছে মা, রোগে!"

বলে হাঁফাতে থাকে! চেপ্টা পাখীর মত এতটুকু বুক। কাঁধগুলো যেন পেছন দিকে ঠেলে গিয়েছে!

হয়ত কেউ জিজ্ঞাসা করে, "হাঁফানির ব্যামো বুঝি মা? আমার ছোট ননদের শ্বশুরবাড়ি খুব ভালো মাদুলি আছে। কোন নেম নেই, খাওয়া দাওয়ার বাদ-বিচের নেই, খালি পাঁচটি পয়সা খরচ!"

অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস সংগ্রহ করে পেসাদী বলে, "শুধু হাঁফানিত নয় মা, রোগের অন্ত নেই! জ্বরত লেগেই আছে। দুদিন যায় চার দিন যায় আর জ্বর, সে কি যেসে জ্বর মা—একেবারে বেহুঁস্! কোথা দিয়ে কি হয়ে যায় মা কোন হদিস্ই পাই না—!"

চারী চালাক মেয়ে, কথা কয় ত কাজ ভোলে না; উড়ে ভারী, কল না ছাড়তে ছাড়তেই কলের মুখে কলসীটি গিয়ে ধরে' বলে, "হাঁ মা, তারপর?"

পেসাদী তাড়াতাড়ি ওঠবার বৃথা চেষ্টা করে বলে, "দোহাই মা, একটু ছেড়ে দে, আমি বসে আছি সেইখন্ আর এইখন! পাঁচজন এসে পড়লে আর মোটে পাবনা!"

"এই যে দিই মা, এই ঘড়াটা আর বালতিটে বইত নয়! তোর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই হয়ে যাবে খ'ন!"

হতাশ হয়ে অগত্যা পেসাদী আবার বলতে স্থরু করে।

"শুধু কি তাই মা, আদ্দেক-দিন ঘুমোবার জো নেই।

একবার শুই আবার উঠে বসি, একবার শুই আবার উঠে বসি, এই করি রাত-ভর! শুইছি কি মনে হবে বুকে যেন কে দশমণি পাথর চাপিয়ে দিয়েছে—দম নিতে পারি না।"

অনেকগুলো কথা বলে পেসাদী দুটো হাত মাটিতে রেখে তার ওপর উবু হয়ে ভর দিয়ে হাঁফায়। কপালে কেঁচোর মত মোটা মোটা দুটো শির ফুলে ওঠে।

চারী বাল্‌তি কলসি ভরে সরিয়ে রেখে, কাপড় ভিজিয়ে কলতলার ইটে পা ঘস্‌তে সুরু করে, বলে, "এত তাড়াতাড়ি আর কেউ আসছে না! গাটাও ধুয়ে যাই! কেমন?"

পেসাদী কিছু বল্‌তে পারেনা, ঝগড়া করতেও দম চাই! কাতর চোখে চেয়ে থাকে।

পা ঘসা সেরে, চারী কলতলায় বসে, ঘুরে ফিরে সর্ব্বাঙ্গ ধোয়, ধুতে ধুতে বলে, "হোক্ না মা, যত রকম রোগই হোক্ না ওই এক মাদুলিতেই সেরে যাবে! এযে আমাদের একেবারে পেত্যক্ষ দেখা কিনা!"

চুপ করে থেকে আর কি লাভ! পেসাদী বলে, "মাদুলির কথা যখন বলছ মা তখন এই দেখ!"

শুকনো সজনে ডালের মত শীর্ণ হাতখানা তুলে দেখায়! কুনুই এর ওপর গণ্ডা-তিনেক মাদুলি বাঁধা,—ছোট বড় তাঁবার, লোহার, হরেক রকমের!

"কিছু হয়নি মা! যে যা বলেছে, কারুর কথা হেলা করিনি! কিছুতে কিছুই হ'ল না মা! ভগোবান বিমুখ—কিসে কি হবে?"

কথা বার্ত্তার মাঝে আরও কজন আসে। নাতনি নিয়ে কনে-বেউ, ছেলে নিয়ে মোক্ষদা—।

সেদিকে একবার চেয়ে একান্ত হতাশ ভাবে পেসাদী বলে যায়—"বিয়ের তোড়া বেচে সেই কোথা ছায়রাক্‌ থেকে তেরসিকে দিয়ে মাদুলি আনালাম, সবাই বল্লে, 'আর ভয় নেই, ছায়রাকের শিব-ঠাকুর বড় জাগ্‌গরত দেবতা। কই মা? বাবা আমায় বাঁ পায়ে এমন করে ঠেলে দিলে!—"

ছোট-খাট ঢোলের মত মাদুলিটি দেখিয়ে আবার বলে, "এই ত রয়েছে মা! আমার যে রোগ সেই রোগ। শুধু ঠেঙানি খেয়ে মরি। লুকিয়ে তোড়া বেচেছি শুনে গুলের বাবা ঠেঙিয়ে গতর পিসে দিলে—!"

চারী শোনে বলে মনে হয় না; গা ধোওয়া সেরে, ভিজে কাপড়েই কাঁকালে ঘড়াটা তুলে নিয়ে হাতে বাল্‌তি ঝুলিয়ে ডান দিকে কাৎ হয়ে চলে যেতে যেতে বলে, "পাঁচটি পয়সা বইত নয়। একবার না হয় দেখই না আনিয়ে!"

পেসাদী তবু কল পায় না। মোক্ষদা তাড়াতাড়ি গিয়ে কলসি ধরে।

মিনতি করে কাঁদ-কাঁদ হয়ে পেসাদী বলে, "তোর পায়ে পড়ি দিদি, আমি এই একটা কলসি ভরে নিই, সেই সবার আগে এসে বসে আছি!"

নাক মুখ বেঁকিয়ে ধমক দিয়ে মোক্ষদা বলে, "বসে আছিস্ ত বসে থাক্ না! মার মাইটাও টেনে খেতে হয়, বসে থাক্‌লে কল পাওয়া যায় না! এগিয়ে এসে ধরিস্‌নি কেন?"

আশা নেই, তবু আর একবার অনুনয় করে,—"তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে কি পারি দিদি! তাইত আগে এসে বসে থাকি! জল নিতে দেরী হলে কুঁতোতে কুঁতোতে সন্ধের আগে আর কাজ কুলিয়ে উঠতে পারি না—সন্ধে হলে ত আর চোখে দেখতে পাব না, হাত পা পুড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে মরব···"

মোক্ষদা এসব কথায় কানও দেয় না!

ডান হাঁটু দিয়ে কলটা টিপে ধরে বাঁ হাতে কলের মুখে কলসি ধরে কনে-বৌএর দিকে ফিরে আলাপ আরম্ভ করে।

আড়ালে যে যাই বলুক মুখের সামনে মোক্ষদাকে ডরায় না এমন বুকের পাটা পাড়ার কারও নেই। মেয়েটাকে দেখলেই ভয় করে, যেমন কালো তেমনি মোটা, বিশাল মোষের মত দেহ!—মুখের ধারও তেমনি। নিজের স্বামীর ত উঠ্‌তে বসতে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, সময়ে সময়ে দু ঘা কসিয়েও নাকি দেয়। বরটাও অকর্ম্মা কুঁড়ের ধাড়ি!—হেলায়-ফেলায় মোক্ষদা যা দেয় দুবেলা

খায় আর আফিঙ্ খেয়ে ঝিমোয়! আফিঙের পয়সা দিতে মোক্ষদা রোজ ঝ্যাটা লাথি মারে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই!

মোক্ষদা বলে, "সেদিন ধোপানি-মাসির বাড়ি অত ঝগড়া ঝাটি কিসের হচ্ছিল গা?"

কনেবৌ সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়, বলে, "কি জানি মা। নিজের ধান্দায় থাকি, অত পরের ঝগড়া শোনবার ফুরসৎ আছে কি?"

মতি এরি মধ্যে কখন এসে বসেছে, সর্ব্বাঙ্গে কি এক রকম বিশ্রী ঘা, নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে নিজে থেকেই বলে, "ঝগড়া ঝাটি আর হ'ল কোথায় দিদি, পটলি একাই ত চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলে।"

আরো দু চার জন এরি মধ্যে এসেছে, যারা জানে না, তারা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কেন? কেন?"

কিন্তু এবার কনে বৌ কথা কয়,—"ঢঙ লো ঢঙ! পটলির ঢঙ জানিস্ না? এ পাড়ায় এসে অবধি কত কীর্ত্তিই না দেখালে। পেরথম হ'ল বিবি সাজা, সে কি বাহার! তার পর তিনি হলেন সন্নেসিনী; নিষ্ঠে দেখে আর বাঁচি না। গঙ্গা চান না, করে জল খান্ না! এখন আবার বুঝি সোণা ছোঁবেন না পণ করেছেন।"

মতি বলে, "সোণা ছোঁবে না কেন গো! এ যে কে দুটো সোণার ফুল কাগজে জড়িয়ে জানালা দিয়ে গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে, আবার কি বলেছে নাকি!—" বলে নোংরা দাঁতের পাটি বার করে হাসে একটু!

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! সোণা ছুঁড়ে ত' মেরেছে, ঢেলা ছুড়ে ত আর মারেনি। এ নিয়ে আবার কেউ হাঁক-ডাক্ করে নাকি! উনি অতি বড় সতী কিনা তাই সতীগিরি ফলালেন।"

মোক্ষদার কলসি ভরা ততক্ষণে শেষ হয়েছে, কলসিটা কাঁকালে তুলে নিয়ে বলে, "যে দিয়েছে তারও বুদ্ধির মাথায় খ্যাংরা! দিতে হলে কেউ অমন করে আবার দেয় নাকি!"

কনে-বৌ তাড়াতাড়ি কলতলায় বাল্‌তিটা পেতে দিয়ে বলে, "তুমি শোন কেন ওসব কথা! ভেতরে অনেক কিছু আছে! সোণা অমনি সস্তা ইট্‌পাটকেল কিনা যে সে গায়ে ছুঁড়ে মারে! কই আমাদের ত কেউ মারে না!"

কথাটা সকলের অত্যন্ত পছন্দ হয়; হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সবাই সায় দেয়।

কনে-বৌ নাৎনিটাকে ধমকে বলে, "টেপ্ না লো জোর করে, খেতে পাস্‌না নাকি?" নাৎনি প্রাণ পণে সমস্ত দেহের ভর দিয়ে দু হাত দিয়ে কল টিপে থাকে।

পেসাদীর চোখদুটো নিস্ফল আক্রোশে জল জল করে! উপায় নেই। হাঁফাতে হাঁফাতে ক্ষীণ গলায় চীৎকার করবার চেষ্টা করে বলে, "অ গুলে, অ মুখ পোড়া, পরের টিন বাজাচ্ছ কেন ওলাউঠো? যমের বাড়ি যাবে কবে? আমার হাড়ে যে বাতাস লাগে তাহলে!"

অত্যন্ত নির্জ্জীব রুগ্ন কঙ্কালসার চেহারা ছেলেটার। শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের বড় মাথাটা লাটুর মত ওপর থেকে নীচের দিকে সূচল হয়ে এসেছে। গলায় হাতে, কোমরে, সর্ব্বাঙ্গে মাদুলি বাঁধা। মাদুলির বাঁধনে কোন রকমে বোধ হয় পৃথিবীতে বাঁধা আছে! প্যাকাটির মত হাত দিয়ে নিতান্ত নির্জ্জীব ভাবে চুপ করে বসে বসে পাশের কার টিনের গায়ে ধীরে ধীরে শব্দ করছিল, মার কথার ভয়ে জড়সড় হয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে চুপ করে বসে।

তবু পেসাদীর রাগ যায় না, নড়াটা ধরে মুখটা মাটিতে ঘসে দিয়ে বলে, "আমায় খেতে এসেছ রাক্ষস! তোমার মরণ হয় না!"

রাক্ষস অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদতে থাকে।

আলাপ এদিকে জমে উঠেছে! মোক্ষদা অনেকক্ষণ কলসি কাঁকালে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা কয়, তারপর কলসি নামায়, শেষ কালে আবার বসে।

—বলে, "আমার সে কথা অনেকদিন মনে হয়েছে! ধোপানি মাসি ত বুড়ি হতে চল্‌ল, আর তার ওই বর? কত আর হবে গগনের বয়স!"

একজন গম্ভীর হয়ে বলে, "কুড়ি!"

এ সময়ে কারুর কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। তবু মোক্ষদা বলে, "আচ্ছা, কুড়ি না হয় নাই হ'ল, ধর পঁচিশ, না হয় ত্রিশই ধর না। তাতেই কি কুলোয় নাকি!"

মতি বলে, "ভেতরে অনেক কিছু গলদ!"

"তা আর নয়! জানা নেই শোনা নেই—কোথা থেকে একদিন পাড়ায় এসে হট্ করে সেঁধুল—তারপর দুদিনে সবাইকে একেবারে হকচকিয়ে দিলে! এই ঘর উঠছে, সেই ঘর উঠছে, এই ঠাকুর পুজো হচ্ছে, সেই নোকজন খাওয়ান হচ্ছে, এই মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে, সেই ছেলে নবাবী করছে, হেন হচ্ছে, তেন হচ্ছে—একেবারে এলাহী কাণ্ড।

"কাপড় ত সব ধোপা ধোপানিই কাচে, এমন আবার কোথায় হয়!"

"আর ওই মহাদেবকে, গগনের ছেলে বলে মনে হয়?"

জটলা অত্যন্ত জমে ওঠে।

মতি কল থেকে হঠাৎ বলে, "ও মোক্ষদা দিদি! তোর কলসি ফুটো কেন লো? সব জল যে গড়িয়ে গেল।"

"কলসি ফুটো!" মোক্ষদা সত্যিই আকাশ থেকে পড়ে!—"এই যে জল ভরে' পাশে বসিয়ে রেখেছি গো! গড়পানা কলসি! কাল কিনেছি!"

মোক্ষদা সবার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়! অজানা অপরাধীর নামে অত্যন্ত কুৎসিৎ গালাগালি করে বলে, "কোন্ গতরখাকী এমন দেইজীপনা করলে বল্‌ত, হাতে তার কুঠ্ হবে না!"

পেসাদী খালি কলসিটা নিয়ে বসে বসে হাঁফায়। মতিকে বলে, "তোর হলে কলটা একবার ছাড়বি দিদি? বেলা যে গেল!"

মোক্ষদা তার দিকে হিংস্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়।

বাঃ, কলসি ফুটোর সে কি জানে!

ক্রমশ—

শিল্পী—শ্রী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

বিচিত্রা

টাকার প্রয়োজন সকলেরই। কাহারও কম কাহারও বেশি। কাজেই যখন বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লেখককেও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর যুক্তকরের সানুনয় আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁর 'সাহিত্য-মন্দিরে'প্রবেশ করিতে দেখি তখন বিস্মিত হই না।

পত্রিকাধিকারীর পক্ষ হইতে টাকা দিবার প্রয়োজন যেখানে নাই, অথচ লেখকের দিক্ দিয়া রচনা-প্রকাশের আগ্রহ যেখানে অত্যন্ত বেশি, সেখানেও সেই অত্যধিক আগ্রহ কেন আসে, কি অসহায় কাতর তার প্রকাশ, তাহাও ভাল করিয়া অনুভব করি।

বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় নিজের প্রিয় রচনাটি সুসজ্জিত দেখিতে কার না ইচ্ছা যায়? নিজের আনন্দ-বেদনার সৃষ্টিটুকু বহুজনের কাছে ধরিয়া দিতে কার না সাধ হয়?

শুধু কি তাই?

বহুজনসমাদৃত পত্রিকায় নিয়মিত লেখা না দিলে লেখকের কবিতা বা প্রবন্ধের বইগুলিই বা বিক্রয় হয় কেমন করিয়া? ভালো করিয়া বিজ্ঞাপন দিবার সামর্থ্য ত নিজের নাই, দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য-ব্যবসায়ীর পত্রে লিখিয়া আসিলেও বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ছাপিবার বিধি ত সেখানে নাই;—কাজেই কোনও প্রকারে অন্যান্য পত্রে বিজ্ঞাপন-প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেও সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রগুলিতে নিয়মিতভাবে রচনা প্রকাশিত না করিলে চলে না—পুস্তকের প্রচার-বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। জনসাধারণের স্মৃতি এম্নি ক্ষীণ, এম্নি দুর্ব্বল, এম্নি অকৃতজ্ঞ!

* * *

কিন্তু সাহিত্য-বণিকের প্রলুব্ধ প্রসারিত হস্তে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে নিজেদের রচনা এমনি ভাবে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর তুলিয়া দিয়া আসিলে দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদের এই আর্থিক দুঃখ-দুর্দ্দশার নিঃশেষ মোচন কেমন করিয়া হইবে, সাহিত্যে সমগ্র প্রাণ-মন ঢালিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করিবার একান্ত বাঞ্ছিত অবসর কবে কেমন করিয়া মিলিবে তাহা ত ভাবিয়া পাই না।

সাহিত্যের পণ্যশালায় আজ যাঁহাদের লেখার চাহিদা আছে, তাঁহারা অতি সামান্য কিছু কিছু আদায় করিয়া লইতেছেন বটে, কিন্তু ঐ অতটুকুতেই কি সকলে সন্তুষ্ট থাকিয়া নিশ্চেষ্ট রহিবেন? ইহার বেশি আর কিছুই কি সেখানে দাবী করিবার নাই?

যে সব হতভাগ্য সাহিত্যিকের রচনার চাহিদা তেমনধারা নাই, অথচ লেখা যাঁহাদের সত্যই ভালো, দুর্ভাগ্যবশতঃ কবিতা লিখিবার বদ্ খেয়াল লইয়া যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন, সাহিত্যের সভায় নিঃসংশয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে-সব নবাগত আজও অখ্যাত, অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত তাঁহাদের দৈনন্দিন আশা ও নিরাশা শক্তি ও সংগ্রাম, ক্ষুধা ও ক্ষুব্ধতার পানে সাহিত্যের যশস্বী বিরাট পুরুষেরা কি একবারও ফিরিয়া তাকাইবার অবসর পাইবেন না?

বস্তুত বিস্মিত হইবার যদি কোথাও কিছু থাকে, তবে সে এইখানেই।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই কয় বৎসরে কয়েকজন উদ্যোগী ভাগ্যবান লোক বেশ সপ্রতিভ ভাবে মাসিকপত্রের ব্যবসা সুরু করিয়া দিলেন; দিনে দিনে তাঁহাদের ব্যবসায়ের অভ্যুদয়ও ঘটিল; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা এই অভ্যুদয় ঘটাইবার সহায়তা করিল তাহারা কেবলই ঠকিয়া চলিল,—আজ পর্য্যন্ত তাহারা তেম্নি অসহায়,

তেমনি বিচ্ছিন্নই থাকিয়া গেল ; এই নির্লজ্জ নির্মম ঠকামি কেমন করিয়া দূর হয় তাহার কথা একবার ভাবিয়াও দেখিল না!

সাহিত্য লইয়া বেনিয়াগিরি দিন-দিন বাড়িয়াই চলিল!

* *
*

এমনি ধারা কতদিন চলিবে তাহাই ভাবি।

কাহারও একার বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় যে সাহিত্যের এই অর্থলোলুপ ব্যবসাদারীর সঙ্কোচ ঘটিবে, এমন ধারা ত মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যদি একবার প্রকাশ্যভাবে এই হীন অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে হয়ত কিছু উপায় হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও সেইটুকুই যথেষ্ট নয়।

স্বার্থ ও লোভের পুরানো শিকড় নির্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলা এম্‌নি কঠিন! দিকে দিকে ইহার সর্ব্ব-নাশা শাখা-প্রশাখার বহরও বড় কম নয়!

বাংলার সাহিত্যসেবীরা যদি সাহিত্য-সেবার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে নিজেদের চিন্তা ও শক্তি প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে এই দুর্দ্দিনের অবসান ঘটিবে কেমন করিয়া?

তাঁহারা যদি সকলে মিলিয়া অচিরে একটি শক্তিমান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দিকে মন না দেন, তাহা হইলে সংসারে বাঁচিয়া থাকিয়া সাহিত্য-সাধনায় অবহিত হইবার দিন এখনও অনেক দূরে।

আজিকার এই প্রাণান্তকর লাঞ্ছনা, অভাব ও অপচয়ের কবল হইতে নিঃশেষে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে লেখক ও গ্রন্থীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোনও উপায় দেখি না।

মুরলীধর বসু

---

* *
*

আমরা বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার গর্ব্ব করি ; বলি—এটা সেই যুগ—যে যুগে মানুষ তাহার পশুত্বের খোলসটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ এ গর্ব্বের সত্যকার কোন দামই নাই। পশুত্বের খোলস খুলিয়া ফেলা কোনো কালে কোনো যুগে মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে কি না জানি না, কিন্তু এখনকার ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, মানুষের মনের পশু একেবারে কখনো মরে না—সে মনের ভিতর সুপ্ত থাকে মাত্র। পাশবিকতাকে পশুশক্তি দ্বারাই সংহত সংযত করিবার সামর্থ্য যে-মুহূর্ত্তে সমাজ হারাইয়া ফেলে সেই মুহূর্ত্তেই তাহা আবার উদ্দাম হইয়া উঠে। তাহার অসংযত ঔদ্ধত্যের কাছে যুক্তি টেঁকে না, দীর্ঘদিনের সংস্কার মিথ্যা হইয়া যায়, মনের যা ধর্ম্ম—স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, মানবতা প্রভৃতি বৃত্তি তাহাও এক মুহূর্ত্তে মাটির উপর ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। এ কথাটা যে কত বড় সত্য তাহার পরিচয় সেদিন চোখের উপর পাবনায় এবং মহরমের দিন এই কলিকাতা সহরেই পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যে হিংস্র পশু ছাড়া আর কিছু নয় মুসলমান গুণ্ডারাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* *
*

সে সব অত্যাচারের প্রত্যেকটির ফিরিস্তি দাখিল করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এ দেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলি তাহার কাহিনী লইয়াই মশগুল হইয়া আছে। এখন যে কাজ বেশী জরুরী হইয়া পড়িয়াছে তাহা অন্য রকমের। সে কাজ বর্ত্তমানের এই ক্রমবর্দ্ধমান পাশবিকতাকে এমন একটা ঘা দেওয়া যাহাতে সে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে। এ ঘা অনায়াসেই দিতে পারিতেন গবর্ণমেণ্ট। তাঁহারা যদি শক্ত হইতেন তবে এ ব্যাপার কখনো এতদূর গড়াইতে পারিত না। সঙ্গীন যে কেবলমাত্র বেশের

শোভা নহে, হাতেরও হাতিয়ার, এ কথাটা যদি উপযুক্ত সময়ে বুঝিতে পারা যাইত তবে অনেক পশুর উদ্ধত স্পর্দ্ধা কাজের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার হয়তো অবকাশই পাইত না। গবর্ণমেণ্ট কেন যে তাহা করেন নাই জানি না। হয় তো তাঁহাদের মনে এখনও Divide & Rule Policy-র মোহটাই জয়ী হইয়া জাগিয়া আছে! কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটাও মনে রাখা দরকার, আগুন লইয়া খেলায় যেমন কৃতিত্ব আছে আশঙ্কাও তাহা অপেক্ষা কম নাই। খেলোয়াড় বুঝিতে না পারিলেও আগুন অনেক সময় তাহার আয়ত্তের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং তখন যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার দেহে আগুন ধরাও অসম্ভব নহে।

* *
*

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে ত্রুটির কথা গবর্ণমেণ্ট বুঝিবেন। তাহা লইয়া আমাদের মাথা না ঘামাইলেও চলে। আমাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথাটাই আজ আমাদের ভালো করিয়া যাচাই করিয়া দেখা দরকার। আমরা গর্ব্ব করি, আমরা অনাদি কালের সেই কোন্ ভোরে জন্মাইয়া আজ পর্য্যন্তও টিকিয়া আছি। হিন্দু টিকিয়া আছে সত্য—কিন্তু কি ভাবে টিকিয়া আছে! তাহার জীবন বিপন্ন, ধন-সম্পত্তি নিরাপদ নহে, নারী নির্য্যাতিতা—তাহার সম্মান রক্ষা করার শক্তি তাহার নাই, ধর্ম্মও গুণ্ডারা ধমক দিয়া কল্মা পড়াইয়া নষ্ট করিতেছে। দুই এক জায়গায় নহে, গোটা বাংলায় হিন্দুদের অবস্থা এইরূপ—যেখানে তাহারা দলে হাল্কা সেখানে তো কথাই নাই, যেখানে দলে ভারি সেখানকার অবস্থাও ঐ একই রকমের। হিন্দু তাহার অস্তিত্ব লইয়া টিকিয়া আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব লইয়া টিকিয়া নাই। হিন্দুর হাজার হাজার বৎসরের জীবনে ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা তাহার আর কখনো হইয়াছে কি না সন্দেহ।

* *
*

জাতির এই দুরবস্থার জন্য আমরা সাধারণতঃ শাসন-তন্ত্রেরই দোষ দিয়া থাকি। বস্তুতঃ দোষও তাহাদের অল্প নহে। হিন্দু পরাধীন হইয়াছে চিরদিন। কিন্তু দেড় শত বৎসর আগেও এরূপ অসম্ভব রকমের অধঃপতন তাহার হয় নাই—ক্লীবত্বকে সে তখনও দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের এই কয়েকটা বৎসরের ভিতরেই সে যখন অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ইহার কতকটা দায়িত্ব যে এ দেশের শাসন-তন্ত্রের তাহা কোনো প্রকারেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নটাও আসিয়া পড়ে—হিন্দুর সঙ্গেই মুসলমানেরাও পরাধীন হইয়াছে। তাহাদের রক্তের ভিতর ভীরুতাটা হিন্দুর রক্তের ভিতর যেমন করিয়া মিশিয়াছে তেমন করিয়া মেশে নাই কেন? * * * এ কথার উত্তর খুব কঠিন নহে। হিন্দু যে শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব্ব করে এবং মুসলমান যে শিক্ষা ও সভ্যতা পায় নাই, হিন্দুর অধঃপতনের কারণ বিশেষভাবে সেই শিক্ষা ও সভ্যতা। জ্ঞান খারাপ জিনিষ নহে। কিন্তু যে জ্ঞান মানুষকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে শিক্ষা দেয় না তাহার দাম কি? আসল কথা, আমাদের শিক্ষা-সহবৎ আগাগোড়াই ধার করা জিনিষ—রোখো জরাজীর্ণ মাল— ভিতরে যাহার এতটুকুও সারবস্তু নাই। ইংরেজ যে শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়াছে ইহাকেও আমরা সেই জিনিষ মনে করিয়াই ভুল করি। কিন্তু ইহার ভিতর যে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। ইংরেজ তাহার একজন নারীর উপর একটু অত্যাচার ঘটিলে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটায়, কিন্তু আমাদের গোটা জাতির নারীর উপর অত্যাচার ঘটিলেও আমরা আঙুলটি তুলিতে সাহস পাই না। পরের জিনিষকে নিজের মত করিয়া লইবার শক্তি যাহাদের নাই, পরের জিনিষ লইয়া এই ভাবেই তাহারা পণ্ডিত হয়। আজিকার এই দুর্দ্দিনে হিন্দু-সমাজের দায়িত্বহীনতা, ক্লৈব্য এবং নির্লিপ্ততা এই কথাটাই আজ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

* *
*

* *
*

হিন্দু যদি ইংরেজের যা সত্যকার শিক্ষা তাহা পাইত তবে তাহার শিক্ষিত অশিক্ষিত আজ মৃত্যুপণ করিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইত, অত্যাচারী তাহার দুয়ারে আসিয়া হানা দিলে মুষ্টিমেয় লোক লইয়াও হাজার লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে ভয় পাইত না, এ সময়ে অর্থের মমতা তাহাদের দূর হইত, সংগঠন নিজেদের ভিতরের তাগিদেই গড়িয়া উঠিত, ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ঢিমে-তেতালা অবস্থাটাকে জিয়াইয়া না রাখিয়া সে তাহা বন্ধ করিয়া দিত। 'মানীর অপমান শিরোচ্ছেদ তুল্য' এ-কথাটা পুঁথীর কথা না হইয়া কাজের ভিতর দিয়া সত্য হইয়া উঠিত। হিন্দু ইউরোপের সে শিক্ষাও পায় নাই, ভারতের যে শিক্ষা তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। তাই এ দুর্ভাগ্য ছাড়া তাহার ভাগ্য-দেবতা তাহাকে আর কি দিতে পারেন? অদৃশ্য লোকে বসিয়া বিধাতা হয়তো পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—ইহাতেও তাহাদের ঘুম ভাঙ্গে কি না—মোহ টুটে কিনা!

* *
*

ভারতীয় বণিক-সমিতি লাট দরবারে এক ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, বহু লোক মরিয়াছে, বহু ধন লুণ্ঠিত হইয়াছে, সহরের সঙ্গে পল্লীর কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি অনেক অভিযোগের ফিরিস্তি দিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন ও নিবেদনের ঝুলি উজাড় করিয়া নাকি কান্না কাঁদিয়া আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে কি ব্যবস্থা করিবেন জানা কথা। আর তাহা না জানা থাকিলেও, যাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিজেদের হাতের ভিতরেই আছে, তাহার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইবার গ্লানি না কিনিলেও চলিত। একথা তাঁহারাও জানেন ও ইংরেজও জানে যে এদেশে ইংরেজের একমাত্র আকর্ষণ বাণিজ্য। শোষণের ব্যবস্থা বন্ধ হইলে এদেশের প্রতি তাহাদের আর এত-টুকুও লোভ নাই। তাহাদের বাণিজ্যের প্রহসন এই শোষণেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এ দেশকে শাসন করিতেছে ইংরেজ-রাজার শাসন-তন্ত্র নহে, ইংরেজ-বণিকের বাণিজ্য-তন্ত্র। এই বণিক-সম্প্রদায়কে যদি বিচলিত করিতে পারা যায় তবে ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের দ্বারাও অনেক কিছু করানো চলে। ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় যদি গবর্ণমেণ্টের দুয়ারে হাত না পাতিয়া অন্ততঃ মাস খানেকের জন্যও ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাবনিকাশ গোনার পাটটা বন্ধ করিয়া দিতেন তবে তাঁহারা যাহা চাহিতেছেন তাহা পাওয়া হয়তো কঠিন হইত না। কিন্তু মানের জন্য, ইজ্জতের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা একটা মাসও কারবার বন্ধ করিতে পারেন না, কোটি টাকার মালিক হইয়াও ক'টি টাকার মোহ যাঁহাদের কাছে বড়, তাঁহাদের দাবীর ভিতরেও জোর নাই এবং নিবেদনের ভিতরেও একাগ্রতা নাই—একথা সকলেই বোঝে। জোরহীন দাবী ও প্রাণহীন নিবেদনের যে ফল এ ক্ষেত্রে হয়তো তাহার বেশী কিছু হইবে না। যদি সত্যকার কিছু আদায় করিতে হয় তবে সত্যকার পথটার খোঁজ লইয়া সেই পথেই যাত্রা করা দরকার। বড় বাজারের অলিতে গলিতে যে 'ষ্টিম' জমিয়া আছে তাহারই জোরে যে ক্লাইভ ষ্ট্রিটের ইঞ্জিন চলিতেছে—এ-কথাতো পরিষ্কার জানা কথা। ইহার পরেও যদি কোথায় চাপ দিয়া কাজ করিতে হইবে তাহা ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় বুঝিতে না পারেন তবে মিথ্যা এই আবেদন নিবেদনের থালা বহিয়া লাভ কি? যে কালি গোটা জাতির মুখে মাখিয়া আছে তাহাকে গাঢ়তর করিয়া তোলায় কিছুমাত্র বাহাদুরী নাই।

* *
*

'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'লিগ অব নেশন্‌সের' আমন্ত্রণে জেনাভায় যাইতেছেন।

বাংলার সংবাদপত্রসেবী মাত্রের পক্ষেই এটা গৌরবের কথা। 'লিগ অব নেশন্‌সের' দরবারে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কোন উপকার হইবে তাহা আমরা মনে করি না। কারণ উপকার করা না-করার শক্তি আছে কেবলমাত্র জাতির নিজের হাতে। তথাপি ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক অবস্থা, তাহার শাসনতন্ত্রের সত্যকার স্বরূপ বিদেশীদের চোখের কাছে কোনোখানে কিছুমাত্র গোপন না করিয়া তুলিয়া ধরিবারও যে একটা প্রয়োজন আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বিদেশীদের দরবারে সে ছবি আঁকিবার চেষ্টা আরো অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু মনের ভিতর যে তেজ থাকিলে, তুলিতে যে শক্তি থাকিলে তাহা ঠিকভাবে ফুটানো যায় সে শক্তি লইয়া খুব বেশী লোক সাগরের পারে পাড়ি জমান নাই। সে শক্তি, সে তেজ যে রামানন্দবাবুর আছে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' এই দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন। চিত্তের স্বাধীনতায় এই পরাধীন দেশে রামানন্দবাবুর জোড়া খুব কম। 'লিগ অব নেশন্‌স' তাঁহাকে যাতায়াতের পাথেয় এবং সেখানকার অবস্থানের খরচ দিতে চাহিয়া-ছিলেন। পাছে তাঁহাদের অর্থগুলি তাঁহার মনের স্বাধীনতার উপরে ট্যাক্স বসায় এই জন্য তিনি তাহা স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি—তাঁহার যাত্রা শুভ হোক, পথ নিরাপদ হোক্, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক!

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

প্রলোভন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
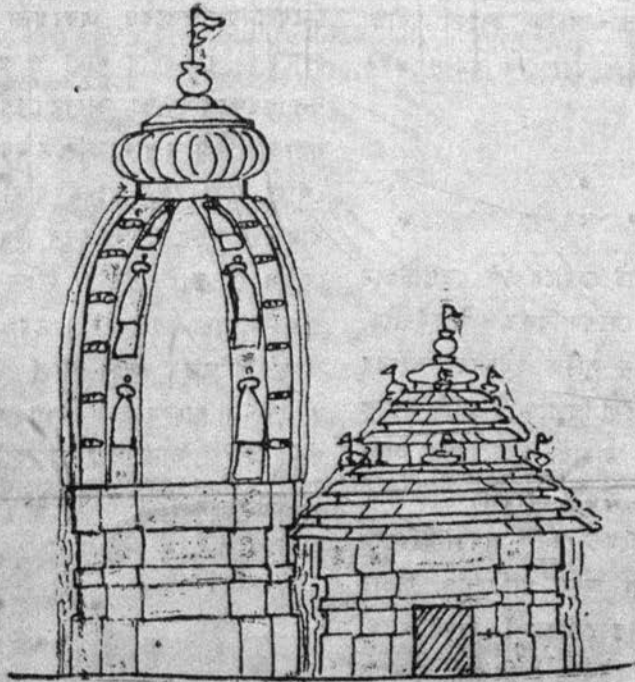
কালি-কলম

১ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল [৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রেম ও ফুল

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

সূচনা

হেথায় কেহই কহিবে না কোনো কথা,
কারো সাথে কারো নাই যেরে পরিচয়;
নিদারুণ এই জীবনের নীরবতা—
প্রণয় সে নয় নাম যার পরিণয়!

শুধু চেয়ে থাকা অনিমেষ আঁখি তুলে'
তারাটির পানে সারাটি গোধূলি-বেলা,
শুধু বসে' থাকা বিজন সাগরকূলে—
আপনারি মনে ভালোবাসা-বাসি খেলা!

তুমিও বাতাসে জালিও না দীপটিরে—
কতকাল র'বে অঞ্চলতলে ঝাঁপি'?
বক্ষ তাপিবে,—নিবারি' আঁখির নীরে
ওগো কতকাল রাখিবি তাহারে চাপি'?

———

(প্রথম খণ্ড)

১

বয়স তখন এমন বেশি নয়—
সতেরো কি আঠারোই হবে,
পল্লী-বধূর লজ্জা তবু হয়,
পাশ কাটিয়ে ঘোম্‌টা টানে সবে।

লজ্জা তাদের যতই না সে হোক
আমার কিন্তু বেশি তাদের চেয়ে,
মাটির 'পরে নুইয়ে যেত চোখ,
পাছে দেখে ঘোম্‌টা থেকে চেয়ে।

বাল্যসখী—যাদের সাথে কত
বকুলতলায় ফুল সে কাড়াকাড়ি,
ছোট্ট মেয়ে, ছোট বোনের মত
গাল খেত সে 'দূর হ' লক্ষ্মীছাড়ী'—

তারাই এখন মস্ত বড় যেন,
চোখের পানে চাইতে কেমন ঠেকে!
ভাবি, এমন লুকোচুরী কেন?
সরল চোখের চাউনি কেন বেঁকে?

এমন সময় হঠাৎ দেখা হ'ল—
ষষ্ঠীতলায় ভাইটি কোলে করে',
কপাল-ঘেরা কালোচুলের থোলো—
দাঁড়িয়ে আছে নীলাম্বরী পরে'।

সকালবেলা, চৈত্রমাসের শেষ—
আঁধার-ভোরের আগুন-খেলা দেখে
ফিরছি তখন, ভজন-গানের রেশ
কানে আমার জাগ্‌ছে থেকে থেকে।

সেই দিকেতে চাঁপার খোঁজে এসে
আর এক ফুলের পেলাম পরিচয়,
সবুজ পাতায় একটি উঠে হেসে,
আর একটি—সে গাছের ভূষণ নয়।

ফুলের মতন,—ফুল কি যেমন তেমন!
সকল ফুলের রংটি তাহার মাঝে,
সকল গন্ধ মধু'র আয়োজন
চোখের কোণে, চিবুক ঠোঁটের ভাঁজে

হাওয়ায়-কাঁপা গাছের পাতার ফাঁকে
একটি সে গোল সোণার মতন আলো
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মুখে নাকে—
গভীর গোলাপ-রংটি ফোটায় ভালো

কিন্তু তারে ছোট হ'তেই জানি,
জয়ন্তী সে—মুখুজ্জেদের মেয়ে,
সুন্দরী সে, সবার মতই মানি,
এমন করে' থাকিনি ত' চেয়ে।

ঠোঁটের এবং জোড়াভুরুর মিল
নতুন ত' নয়—আগেও ছিল নাকি ?
চোখের পাতায় পদ্মদুটি নীল
অতল দীঘির আভাস দিল নাকি ?

দেখেছি তায় অনেক অনেক দিন,
এমন দেখা দেখিনি ত' আগে !
এ কোন্ সুরে বাজ্‌ল প্রাণের বীণ
চোখে আমার এ কোন্ স্বপন জাগে !

২

বল্‌লে—কুলীন তারা,
আমরা ছোট ঘর,
বিয়ের নেই ক' তাড়া—
আগে জুটুক বর।

লক্ষ্মী এলেন ঘরে,
নিত্য বসত তাঁর—
এখন কোজাগরে
নেই ক' তিথি-বার।

তিনটি বছর পরে,
অনেক সাধনায়
নিয়ে এলাম ঘরে,
ফাগুন তখন যায়।

বসন্তেরি ফুল
ফুট্‌বে সারা বছর,
অমানিশাও ভুল—
নিত্যি চাঁদের বাদর।

সিঁথি কেমন রাঙা,
রক্তচেলীর বেশ !
ডালটি থেকে ভাঙা—
গোলাপ-তোলা শেষ !

ফুল-শয্যার রাতে
সেই যে আলাপন,
হাতটি নিয়ে হাতে
প্রেমের গুঞ্জরণ—

যেমন আকাশ থেকে
রঙ্‌টি পটে তুলে'
নিজের নামটি লেখে
পোটো তাহার মূলে।

"তোমায় ভালোবাসি,
বাসবে আমায় ফিরে' ?
পরাও ফুলের ফাঁসি
গলাটি মোর ঘিরে'।"

—যেমন বলিয়াছি
অম্‌নি আপন হাতে
গলার মালাগাছি
পরায় প্রণাম সাথে।

হিঁদুর মেয়েই এমন
ফুলের মতন ফোটে,
ঠাকুর হোক না যেমন—
পায়ের উপর লোটে!

ধন্য আমার জাতি,
ধন্য আমার দেশ!
প্রাণ যে ওঠে মাতি'—
সুখের নাহি শেষ!

৩

বছর পরে বছর ঘুরে গেল
একে একে তিনটি কেমন করে',
চৈত্র শেষে বোশেখ ফিরে এল,
বনের রাঙা সিমূল গেল ঝরে'।

ধরণ-ধারণ বড়ই সাদাসিধে,
যা' কিছু দাও সবই মনের মতন,
কিছুতে তার হৃদয় নাহি বিঁধে,
আপন বলে' কিছুতে নাই যতন!

ভাবছি বসে',—ভাবি এখন প্রায়ই
একলাটি এই সন্ধেবেলাটিতে,—
স্বপন যখন স্বপন আর সে নাই-ই,
কি হয় তারে টাঙিয়ে ঘরের ভিতে!

সাজার চেয়ে পরকে সাজাবারে
কেমন যেন অধিক আকিঞ্চন,
পৌঁছে দিতে শয়নঘরের দ্বারে—
লাজুক ক'নের সে-ই যে আপন জন।

বধূর আমার চোখের ভ্রমর দুটি
কেমন যেন ছবির মতই আঁকা,
পদ্ম দুটি তেম্‌নি আছে ফুটি',
ভুরুও নয় একটু বেশি বাঁকা!

নাই যে বিষাদ, নাই যে অভিমান,
হাসিটি তার যখনই চাও আছে,
অনাদরেও আদর সম জ্ঞান,
যেমন ডাকি, দাঁড়ায় এসে কাছে।

কেমন করে' এমন ছবি নিয়ে
এমনতর করি পুতুল-খেলা ?
আঘাত পরেও আঘাত যারে দিয়ে
ঘোচান দায় অটল অবহেলা !

বুকের কাছে ঘুমিয়ে যখন পড়ে—
আলুথালু কালোচুলের খোলো,
অধর-পাতা কেমন যেন নড়ে,
চোখের পাতা সজল হোল' হোল' !

সত্য সে কি এমন সরল হবে ?
হৃদয়হীনা ?—স্বভাব-উদাসীন ?
শূন্যমনা ?—কে আমারে ক'বে ?
পাই না কিছু ভেবেও নিশিদিন।

ঘুমের দেশে স্বপন-পুরীর মাঝে
আত্মাবধূ রাত্রে জেগে উঠে ?
মানস-বীণে কি সুর তখন বাজে ?
দিনের বেলায় সোণার পরশ টুটে !

চুপে চুপে পরাই বাহুর ডোর,
ধীরে অধর পরশ করাই মুখে,—
ঘুমের সাথে জড়ায় নেশার ঘোর,
শিউরে উঠে' দু'হাত চাপে বুকে।

ফুটিয়াছে জলে বিকচ কমল-ফুল,
অরুণ-বরণ সকরুণ ঢল-ঢল—
মধু-সৌরভে আকুল ভ্রমরকুল
গুণ্ গুণ্ করে, "মধু দিবি কি না বল্" ।

ফুটিয়াছে বনে রূপসী গোলাপ-বালা—
জ্যোৎস্না-নিশীথে সমীরে অধীর হিয়া,
আনন-আলোকে সারাটি কানন আলা,
পিপাসী পাপিয়া ডাকে তারে, "পিয়া ! পিয়া !"

সরসী-শয়নে ছিল যেই হাসিমুখে—
দেবতার পায়ে ছিঁড়ে দিল তায় তুলি',
ফুটেছিল যেই কাননে সোহাগ-সুখে—
আতরে দানিল দলিত সে দলগুলি !

৪

চুপটি করে' একলাটি নির্জ্জনে
বসে' বসে' কেনই এত ভাবি,
ভাবনা এ সব নিজের মনে মনে,
মনরে আমার! সুখ সে কোথায় পাবি?

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তামণির সন্ধানে কি যায়?

আধেক আঁখি—আধেক কর্ণ রুধি',
মুখের হাসি মুখের কথায় ভোর
হয় না যে জন, সে জন চক্ষু মুদি'
জীবনটারে করুক আঁধার ঘোর!

মনে হ'ল, নারীর হৃদয়মূলে
স্বভাব-শোভার পাতায় আড়াল-করা
কোন্ বাসনার কুসুমখানি দুলে,
—কোন্ পুরুষের চিত্তে পড়ে ধরা!

জগৎ-জোড়া এই যে প্রেমের কথা,
এর কি কোনো অর্থ আছে কিছু?
সবাই বোঝে নিজের বুকের ব্যথা,
সবাই ছোটে আপন পিছু পিছু।

হৃদয় পাওয়া হৃদয় বিনিময়ে—
কিছুতে যে হবার সে নয়, নয়!
যেটুকু লাভ প্রেমের পরিচয়ে,
সে যে কেবল আপন মনেই হয়।

তোমার টাকায় আমার মুখের ছাপ
যে কয়টিতে দেখ্‌তে আমি পাই—
তাইতে করি তোমার প্রেমের মাপ,
তোমার আসল রুপোর মূল্য নাই!

তুমি তোমার মুক্তামালা খুলে'
আমার সোণার সিঁথির দেবে পণ—
আমার গলায় মুক্তামালা দুলে,
তোমার মাথায় সোণার আভরণ।

তাই ত' ভাবি, এমন মিলন-মূলে
নেই যে কোথাও সমান পরিচয়—
পাশাপাশি দুইটি মনের ভুলে
একটানা সে ভুলের অভিনয়!

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তামণির সন্ধানে কি যায়?

৫

আজ্‌কে আমার মনের বাতায়নে
দখিন-হাওয়া বইছে ঝিরি-ঝিরি,
কাননে ওই আলোক ছায়ার সনে
খেল্‌ছে খেলা গন্ধলতায় ঘিরি'।

আজকে আমার মনের গগন-গা'য়
হাস্‌ছে যেন পূর্ণিমারি চাঁদ,
জোয়ার-টানে আকুল জ্যোৎস্নায়
ভেসে গেছে হৃদয়-নদীর বাঁধ।

আজকে আমার চোখের যত জল
উপ্‌ছে' উঠে' শীতল করে বুক,
অশ্রু যেন হাসির মধুর ছল,
ব্যথাও যেন গভীরতর সুখ!

কান্না যেন গানের মতন সুরে
ছাপিয়ে উঠে হৃদয়-কিনারায়,
চিত্তবীণার সকল তন্ত্রী জুড়ে'
কাঁপছে আশা মধুর দুরাশায়!

যেমন আছ—তেম্‌নি এস, এস!
বস' আমার হৃদয়-সিংহাসনে!
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো—
যা' আছে থাক্‌ তোমার মনে-মনে।

বল শুধু 'বাসি তোমায় ভালো'—
বুকে যা' থাক্‌, মুখে হ'লেই হবে,
তোমার চোখে আমার চোখের আলো
সবটু' দেবো, দুঃখ নাহি র'বে।

আমার মনের গোলাপ-বনের মালা
পরিয়ে দেবো তোমার কপাল ঘিরে',
আমার হাতের প্রীতির বরণ-ডালা
পরশ করে' আমায় দেবে ফিরে'।

তোমায় আমার সাধের বেদী 'পরে
বসাই এস, পাষাণ-গড়া দেবী!
থির অধরের সাদা হাসির তরে
রক্ত-সিঁদূর দিয়ে চরণ সেবি।

আমি আমায় তোমার ভিতর দিয়ে
বাস্‌ব সে কি গভীর ভালোবাসা!
শূন্য কলস নিজেই ভরে' নিয়ে
কণ্ঠে তাহার তুল্‌ব কলভাষা।

তোমার কোনো দুঃখ যে নাই, নারি!
ফুলের মতন উদাস হাসি হাসো—
কি সুখ তোমার বুঝ্‌তে নাহি পারি,
—কাউকে যদি ভালোই নাহি বাসো।

জন্ম হ'তেই অন্ধ যাহার আঁখি,
আলোক লাগি' তাহার কিসের শোক?
প্রভাত করুক যতই ডাকাডাকি,
কখ্‌খনো সে খুল্‌বে না তার চোখ!

যেমন আছ তেম্‌নি এস, এস!
ব'স আমার হৃদয়-সিংহাসনে!
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো,
যা' থাকে থাক্‌ তোমার মনে-মনে।

শীত-কুয়াসায় ফুটিয়াছে গাঁদা-ফুল,
তুষার-শীতল কঠিন তাহার দল—
ঝরিল না দেখি' সকলেই করে ভুল,
মরে' গেছে, তবু করে যে ফোটার ছল!

সুখের হাসি যে দেখিলেই চেনা যায়,
বড় সে চপল, এই নাই, এই আছে—
সুচিকণ, কচি, বাতাসে দোদুল-কায়
পাতায় যেমন প্রভাতের আলো নাচে।

ও যে হাসি, হায়, সোণার-বরণ দলে—
তুষার-কঠিন, সবটুকু মধু ঝরা!
ও যে হাসি, হায়, অধর-পাথর তলে,
মরণে অমর—রয়েছে সমাধি-করা!

(আগামী বারে সমাপ্য)

শাওন মেঁ সামলিয়া

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

শাওন আসিয়াছে, পুরবৈয়া বায়ু পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণ-কালো ঘন মেঘের ঘটা লইয়া আসিয়াছে এই শুষ্ক রুক্ষ রসহীন তপ্তবায়ুদগ্ধ পশ্চিম প্রদেশের বুকে। বাহিরের দিক দিয়া প্রকৃতির রূপের এ এক অসম্ভাবিত রূপান্তর। এ রূপান্তরের পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার বাঙলা দেশে লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। রসময়ী বাঙলার প্রাকৃতিক যুগান্তর এমন করিয়া হয় না। এ তো তবু বাহিরের কথা। সব চেয়ে অদ্ভুত যে রূপান্তর লক্ষ্য করিলাম, তাহা এই পশ্চিমের অন্তর-ক্ষেত্রে—। এতখানি রসহীন রুক্ষতার মধ্যে যে অকস্মাৎ কেমন করিয়া এতবেশি ব্যাকুল ব্যথার আবির্ভাব ঘটে সেইটাই আশ্চর্য্য। সেই কথাটাই আজ আলোচনা করিব।

কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিবসকে বিরহবিধুর যক্ষের ব্যথার পূজা দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া গিয়াছেন, সে আজ হাজার দুই বছরের কথা। বর্ষা-সমাগমে কালিদাস যে ব্যথায় কাতর হইয়াছিলেন সেই ব্যথাটি যদি কালিদাসের অন্তরেরই ব্যথা হইত শুধু, তাহা হইলে মেঘদূত চিরকালের জন্য বিরহীর দৌত্য করিতে পারিত না। তাই মনে হয়, বর্ষার অন্তরে বিরহের একটি চিরন্তন ব্যথা নিহিত রহিয়াছে; একদিন সেই ব্যথাই কালিদাসকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, আর সেই ব্যথাই চিরদিন ধরিয়া প্রতি মানব মানবীর অন্তরে কত না নব মেঘদূত রচনা করিয়া চলিয়াছে! বর্ষা কোন্ অনাদি বিরহের একখানি জলভরা ব্যথাকে না জানি কোন্ সুদূর হইতে বহন করিয়া মানব-অন্তর-প্রান্তরের উপর দিয়া আবার কোথায় চলিয়াছে কে জানে!

২

চোখের জলের যত কথা, বিরহের যত বেদনা আর ক্রন্দন, এই বর্ষায় কেন সে-সব এমন করিয়া চিত্তাকাশকে শ্রাবণ-মেঘের মতই ভরিয়া তুলিতে থাকে?

ভোরের আলোয় কেন করুণ ভৈরবীর বিধুর ব্যথা সজল হইয়া উঠে, সন্ধ্যার ম্লান আলোয় কেন বিষাদে মন ছাইয়া আসে, শরতের সুনীলে কেন একখানি প্রসন্ন প্রশান্তিময় হাসি মানুষের অন্তরকে স্নিগ্ধস্পর্শে জুড়াইয়া দেয়, কেনই বা দিগন্ত-আগত কালো মেঘের আগমনে প্রিয়-বিরহের কথাটিই এমন করিয়া মানুষকে ব্যথা-বিহ্বল করিতে থাকে, তাহা কে জানে!

কালো মেঘের কালো ছায়া মানবচিত্তের উপর কি জানি কোন্ বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের ছায়া পাত করে! কালো মেঘ আকাশের উপর দিয়া কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, সুদূর প্রবাসের প্রিয় সেও এমনি অশ্রুভরা বুক লইয়া আসিবে কি না সেই ভাবনায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। যত ব্যথার কাব্য তাই বর্ষাকালের। বৈষ্ণব-কবিতার শ্রীরাধিকার অভিসার তাই চিরকাল তিমির দিগ্‌ভরি যামিনীর ঝরঝর বর্ষণের মধ্য দিয়া; চোখের জলে কর্দ্দম-পিছল হইয়া গেছে পথখানি তার, সে পথ কোনো কালেও আর শুকাইল না!

এই তো শাওন আসিয়াছে। বাঙলা দেশ এই শাওনকে কি অর্ঘ্য সাজাইয়া দিল, আর এই পশ্চিম দেশই বা তাহাকে কোন্ ব্যথার গানে অভিনন্দন করিল?

৩

বাঙালী জাতিটাই কবির জাতি, এ কথা এত বেশি করিয়া বলা হইয়া গিয়াছে যে একথা আবার বলিতে গেলে একঘেঁয়ে হইয়া উঠিবে। কথাটা হয়ত সত্যই। বাঙালীর মত ভাব-প্রধান ও ভাবপ্রবণ জাতি আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষে যে নাই তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনও তাহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। চিরশ্যামল বাঙলার ভুবনমোহিনী মুর্ত্তি বাঙালীকে সৌন্দর্য্যের পূজা করিতে শিখাইয়াছে। তাই শ্যামসুন্দরের এত বড় প্রেম-পূজা আর কোথাও হয় নাই। বিরহের গভীরতা দিয়া বাঙালী প্রেমকে যে কত বড়, কত মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে তাহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। আবার ঝড়ের এবং প্রলয়েরও এমন ভীষণ সুন্দর মূর্ত্তি আর কোথায় ফুটিয়াছে! শ্যামার ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রলয়ঙ্করী মাতৃমূর্ত্তিও আবার এই দেশেরই ভাব-সাধকের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে।

এই তো গেল বাঙালী-প্রশস্তি। এই প্রশস্তির অন্তরালে যে আর এক কথা রহিয়াছে সেটিকেও এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। বাঙালীর কাব্য সাহিত্য, বাঙালীর বাক্যালাপের বৈশিষ্ট্য, এই সমস্তের মধ্যে, এমন কি বাঙালীর রাজনীতি-চর্চ্চার মধ্যে পর্য্যন্ত তাহার কবি-প্রাণের প্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর এই পশ্চিম প্রদেশের সাহিত্য বলিতেই আমাদের হাসি পায়। খুব বেশি গম্ভীর হইতে পারিলে স্বীকার করি যে তুলসীদাস রামায়ণ লিখিয়া এই প্রদেশবাসীকে হনুমানজীর ভক্ত করিয়া গিয়াছেন; আরো স্বীকার করি যে মধ্যযুগে সুরদাস কবীর প্রভৃতি কয়েক জন ভক্ত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বেশী কিছু স্বীকার করিতে গেলে বাধে। বাস্তবিক কাব্যসাহিত্য বলিতে তো শুধু ভজন বোঝায় না। মানব হৃদয়ের কত বিচিত্র সুখ দুঃখ ভালবাসার অনুভূতি; সেই অনুভূতি যদি কাব্যসাহিত্যে প্রকাশ না পায় তাহা হইলে তাহাকে আর যাহাই বলি খাঁটি কাব্যসাহিত্য বলিতে একটুখানি দ্বিধা আসিবেই। সৌন্দর্য্যানুভূতি, মানব হৃদয়ের নানা বিচিত্র বেদনা ও আনন্দের প্রকাশ, যে সাহিত্যে ফুটিল না, তাহাকে কাব্যসাহিত্য বলিয়া বেশি গৌরব করা চলে না। বর্ত্তমান যুগের হিন্দী কবিদের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় ইঁহাদের মধ্যে অনুভূতির সাধনা নাই। ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ রচনা নীতি-শতকের কোঠাও বহু কষ্টে পার হইয়া আসিতে পারে না।

মামুলি প্রথায় নানা ছন্দে অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী নানা রকমের অলঙ্কার দিয়া ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তাহাকে দিয়া কোনো একটা উপদেশ দেওয়ানই কবিদের কর্ম্ম বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। সত্যকার সৌন্দর্য্য ও বেদনানুভূতি ইঁহাদের রচনায় অতি দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়িয়া বাস্তব মানুষের জগতে নামিলেও ওই একই কথা মনে না হইয়া পারে না। এ দেশে যাঁহারা সেক্সপীয়র শেলি-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যজমানী করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে এ দেশীয় যুবকদের সূক্ষ্ম রসানুভূতির কি অভাব। শব্দার্থকে ছাড়িয়া গূঢ় ব্যঞ্জনার্থ ইহারা বুঝিতেই পারে না। ইহাদের অনুভূতি মানসলোকের অতীন্দ্রিয় স্তরে মোটেই বিচরণ করিতে পারে না। তারপর যদি এই দেশীয় বার্ত্তালাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে তো শ্রদ্ধা রাখিবার আর ঠাঁই পাওয়া যায় না। সাধারণ চাষাভূষো শ্রেণীর মানুষেরা যখন একটু মিত্রভাবে রহস্যালাপ করে তখন সেই রহস্যালাপ সহ্য করিবার শক্তি বাঙলা দেশের অতি বড় চাষারও আছে কি না জানি না। সাধারণ ইতর সম্প্রদায়ের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল; যাহারা কলেজে পড়ে, শেলি-রবীন্দ্রনাথ-সেক্সপীয়র লইয়া আলোচনা করে, তাহাদের ভদ্রতাপূর্ণ বন্ধুত্বেরও ফাঁকে ফাঁকে যে সব কথা অতি অসঙ্কোচে এবং আনন্দে বাহির হইয়া আসে, তাহাও সমশ্রেণীর বাঙালী উচ্চারণ তো করিতে পারিবেই না, শুনিতে গিয়াও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিবে। বন্ধুবর্গের মধ্যে ইহারা পরস্পরকে শ'কার ব'কার করিয়া মনে করে পরম রসিকতা করা হইল।

এই সব নানা কারণে বাঙালীর ও হিন্দুস্থানীর মধ্যে মানসিক দূরত্বটা এতই বেশি যে মৈত্রীর মেল ট্রেন চালাইলেও তাহা যে খুব সহজে অতিক্রম করিতে পারা যাইবে এমন মনে হয় না। যতদিন সাহিত্যের সংস্পর্শে দুটি সভ্যতা পরস্পরের নিকট না হইতেছে ততদিন মুখে ভালবাসার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বাড়াইলেও গরমিলের লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হইবে না। যা হোক, সে কথার এখানে প্রয়োজন নাই।

৪

বাঙালীর রসবোধের প্রাচুর্য্য প্রমাণ হইল, পশ্চিমার রুক্ষ রসহীনতা এবং অন্তরের স্থূলতাও নির্দ্ধারিত হইয়া গেল আমাদের প্রাদেশিক অন্তরের দরবারে! কিন্তু এই সমস্ত বিচার এবং সিদ্ধান্তের উপরও এক জন হাসিয়া থাকেন। তাই বিধাতার সেই হাসি ফুটিয়া উঠিল পশ্চিমা রমণীর বসনভূষণের অপরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যে।

বাঙালীর হৃদয়ে রসানুভূতির তীব্রতা হয় ত খুবই বেশি, কিন্তু তাহার বর্ণানুভূতি যে নাই বলিলেই হয়, এই দেশ-বাসিনী রমণীর দিকে চাহিয়া সে কথাটি নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেই হইবে। রঙ বস্তুটা যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যের খনি, তাহার অন্তরে যে কত আনন্দ বেদনার লহরী, তাহার পরতে পরতে কত যে কামনার আবেদন লুকাইয়া আছে তাহা এই-দেশী মেলায় পশ্চিমা রমণীর বসন ভূষণের বর্ণ বৈচিত্র্যের দিকে না চাহিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। তাই বাঙালী চিত্র-শিল্পীকে এই দেশীয়া বর্ণ-বিলাসিনী রমণীর শরণ লইতে হইয়াছে, তাহার বসন-পরার ও ওড়না জড়ানোর অপূর্ব্ব ভঙ্গীটিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বাঙলায় যদি হৃদয়ের রাণীর চরণপাত হইয়া থাকে, এদেশে তাহা হইলে রঙের রাণীর রত্নাসন পাতা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এই যে পশ্চিমের বৈশিষ্ট্য ইহা ধরিবার জন্য বিশেষ কোন দিনলগ্ন না খুঁজিলেও চলে। পশ্চিমে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন এই পশ্চিমা রমণীরা কখনো সাদা কাপড় পরে না; কোনো না কোনো একটা রঙ চাই-ই চাই। সব চেয়ে বেশি করিয়া এই রঙের বিলাস ইহাদের ধরা পড়ে বর্ষা সমাগমে। বাঙালী জনসাধারণের এমন কোন উৎসব আছে কি না জানি না। এমন করিয়া উৎসবের নেশা বাঙালীর প্রাণে শারদোৎসবেও

দেখিতে পাই না। এই একটা ঋতু ধরিয়া ইহাদের এই উৎসব চলিতে থাকে। শ্রাবণ মাস ভরিয়া এই তো ইহাদের কত মেলা চলিয়াছে। সারা বছরের মাঝে ইহাদের এই মাসটি যেন ছুটি; আজ এখানে কাল সেখানে মেলা; আর সেই মেলার উপলক্ষে দলে দলে এক বিচিত্র বর্ণবাহিনী পথ বাহিয়া চলিতে থাকে। যাহারা এই দীর্ঘ বছর অন্তঃপুরের অন্তরালে আপন আপন সংসারের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া ছিল তাহারা আজ পথ বাহিয়া, নানাবর্ণের ভূষণে সাজিয়া আনন্দের কলরব তুলিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে। এ শুধু একটা বর্ণস্রোত যে নানা বর্ণে ফেনায়িত হইয়া চলিয়াছে তাহা নয়, একটা গানের স্রোতও সেই সঙ্গে চলিয়াছে। এই সঙ্গীত স্রোত একটি মাত্র ধুয়া ধরিয়া চলিয়াছে: 'শাওন মাস, প্রিয়া তুমি 'নাই-হর' গিয়াছ, এই ভরা যৌবন কাটিয়া যায় বৃথাই; দাদুরী ডাকে, পাপিয়া ডাকে, প্রাণ যে যায় প্রিয়া! প্রিয়, ও আমার 'সামলিয়া' তুমি কোথায়, বিদেশে গিয়াছ, এই শাওন মাসে আমার যৌবন ব্যর্থ হইয়া যায়, তুমি তো আজিকার দিনে আসিলে না 'বলমুয়া', যে দিন আসিবে সেদিন কি আর আমার এই যৌবন থাকিবে,—এসো, এসো প্রিয় হে!' এই কাজরীর সুরে শাওনের আকাশ বাতাস ভরিয়া গেছে!

৫

বাঙলা দেশের লোক কীর্ত্তনের সুরে পাগল হয়, বাউলের সুরে ভাটিয়ালের সুরে তাহার গোচারণের মাঠ, ফসল-বোনা আর ফসল-কাটার মাঠ উদাস হইয়া উঠে! কিন্তু 'কাজরী' এদেশের লোকের কাছে কি তাহা বুঝিতে হইলে, ওই বর্ণোৎসবের বন্যার সহিত তাহাকে এক করিয়া দেখিতে হইবে।

বাঙালীর কীর্ত্তন-বাউল-ভাটিয়ালের মধ্যে যেমন বাঙালীর অন্তরাত্মার পরিচয় পাই, কাজরীতেও তেমনি হিন্দুস্থানীর অন্তরাত্মার রূপ অতি স্পষ্টই দেখিতে পাই, বাঙালীর বাউল-ভাটিয়াল সুরের অজস্র গ্রাম্য গান যেমন আজও বাঙলা সাহিত্যে স্থান না পাইয়াও বাঙালীর একটি সত্য পরিচয়কে বহন করিয়া চলিয়াছে তেমনি কাজরীও হিন্দীসাহিত্যের ভদ্রাসনে স্থান না পাইয়াও হিন্দুস্থানীর অন্তরের একটি খাঁটি পরিচয় লইয়া চলিয়াছে। উভয়ই গ্রাম্য বলিয়া অবজ্ঞাত, কিন্তু উভয়ই অশিক্ষিত জনসমাজের প্রাণকে রসের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙালীর গ্রাম্যসঙ্গীতের মধ্যে বাঙালীর যে পরিচয় পাই সে পরিচয় গ্রাম্য বলিয়া তুচ্ছ করিবার মত নয়। তাহার ওই সব গ্রাম্য বাউল-ভাটিয়ালের মধ্যে পাই সংসার বৈরাগ্যের একটি উদাস করুণ সুর, অতীন্দ্রিয় জগতের অধিদেবতার নিকট আত্মনিবেদনের আকুতি, মুক্তির একটি বেদনাময় ক্রন্দন। বাঙালীর সঙ্গীত অন্তরের আকুলতায় নিবিড় হইয়া অধ্যাত্মরূপ ধরিয়াছে, তাহার ব্যাকুলতার মধ্যে অহরহ এই সংসার হইতে ত্রাণের একটি কামনা রহিয়াছে। শ্যামসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, দেহতত্ত্বাশ্রিত সঙ্গীত—সর্ব্বত্র ওই এক সুর।

'কাজরী' লোকসাহিত্য হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য, একথা শুধু বাঙলার ভাটিয়াল-বাউলকে সাহিত্যের মধ্যে ধরিতেছি বলিয়া নয়। 'কাজরী' বাস্তবিকই একটা সাহিত্য। এদেশের লোক কাজরীর নামে পাগল। বর্ষা আসিতে না আসিতেই দেখিতে পাই অসংখ্য কাজরীর বই ছাপা হইয়া ফুটপাথে কাপড়ের উপর সাজানো হইয়া গিয়াছে। ছ'পাতা আটপাতার এক একখানি কাজরীগানের বই। দু'পয়সা এক পয়সা মূল্যে এই সব কাজরী গানের বই বিক্রী হইয়া অলিতে গলিতে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। কাজরী গান সংগ্রহের উৎসাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যারা এই সব কাজরী গায় তাহাদের নিরক্ষর বলিলেই হয়; কারণ ইহাদের মাঝে মাঝে যদিবা কেহ কাজরী গান পড়িয়া লয়, সেই পড়িয়া-লওয়াটুকু বহুকষ্টে সম্পন্ন হয়। তবে কাজরীর ভাষা বুঝিবার কোনোই গোলমাল নাই; গ্রাম্য ভাষায়ই, ওই সব নিরক্ষর পাঠকের মতই বিদ্বান কবির রচনা, কোনো রকমে পড়িতে পারা যায়ই। বর্ষা

আসে-আসে আর দেখিতে পাই গয়লা-নন্দন দুধ দিতে চলিয়াছেন, এক হাতে ওই একখানি কাজরী; এক্কাওয়ালা এক্কা চালায় তাহারও ট্যাঁকে মোড়া ওই কাজরী; মুদি ভায়ার তো বসিয়া বসিয়া কাজ, কাজরী পাঠের আগ্রহের আর অন্ত নাই; গ্রাম হইতে যারা আসে তারাও এক একখানি 'কাজরী' লইয়া চলিয়াছে। দিনের অবসান হয়, সন্ধ্যা আসে—তখন তো আর কথাই নাই, সকল কর্ম্মের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, পথের পাশে পাশে, কারো বা ঘরের দাওয়ায় খাটিয়ায় মজলিস বসিয়াছে আর কাজরীর রসমুগ্ধ সুর বহিয়া চলিয়াছে। কুশল প্রশ্নের মত কাজরী সংক্রান্ত প্রশ্নও একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। মেয়ে-পুরুষে এই যে কাজরী লইয়া এতখানি উৎসব ইহার মত ব্যাপার বাঙালী সাধারণের মধ্যে কি লইয়া হয় জানি না।

শ্রাবণ আসিয়াছে, চারিদিক সবুজে সবুজ, আকাশ বাদলে ছাইয়া গেছে। মেয়েরা গাছে দোলনা বাঁধিয়া দোল খায়, যুবকেরা কাজরী-ব্যথার সুরে পথগুলিকে আকুল করিয়া গাহিয়া যায়। রাতকে রাত মেয়েরা দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান গায়, সেই সব গানের মর্ম্ম অনেক সময় বেশি বলা যায় না।

অন্তরে যাহার সূক্ষ্ম রসানুভূতি নাই সে কেমন করিয়া এত সুন্দর বর্ণ বৈচিত্র্যের অনুরাগী হইতে পারে তাহা যেমন ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, তেমনি সে কেমন করিয়া যে সুরের মধ্যে এতখানি গাঢ় হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিতে পারে তাহাও যেন ঠিক বোঝা যায় না। বুঝিবার চেষ্টা পরেও করা যাইতে পারিবে, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে হিন্দুস্থানী কাজরীর সুরে একটি অপরূপ বেদনা মাধুর্য্য রহিয়াছে। কাজরীর ভাষায় যে ভাব ফুটে, কাজরীর সুরে যেন সেই ভাবটি নাই। কাজরীর ভাষায় যে বেদনার প্রকাশ তাহা দেহের যৌবনের কামনার অপরিতৃপ্ত বেদনা; ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহার সর্ব্বত্র অতি স্থূল হইয়া ফুটিয়া আছে। কাজরীর মধ্যে কোনো অতীন্দ্রিয় মিলনের ইঙ্গিত নাই, মুক্তির কোনো আভাস তাহার মধ্যে নাই। কোথাও কোথাও রাধাকৃষ্ণের নামের খোলস রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহার অর্থ কি, কোথায় ইহার জন্ম। 'মেলার পথে কোন্ 'গোরী'র বুকের ওড়না হাওয়ায় উড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে কবির প্রাণ অতি উচাটন হইয়া গেছে, আর সওয়া যায় না; 'গোরী' কেন অমন করিয়া চলিয়া গেল, তাহার সুন্দর দেহখানি যে কবিকে পাগল করিয়া গেল!' কাজরীর মর্ম্ম কথাটি এই।

৬

আদিম মানুষও নারীর অভাব অনুভব করে, উন্নত সভ্য মানুষও নারীকে কামনা করে। অনেকে বলেন দুইই এক। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে বাস্তবরূপগত ভেদ যে অনেকখানি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভেদ আছে বলিয়াই কাজরী গানকে তাহার কথার অর্থের দিক দিয়া বাঙালী গ্রহণ করিতে পারিবে না; এদেশে যে-সব গান খোলা রাস্তায় দুই তিন বন্ধুতে গলাগলি করিয়া গাহিয়া যায় বাঙলা দেশের নিরক্ষর চাষা সেই সব গান জনশূন্য মাঠেও নিঃসঙ্কোচে গাহিয়া যাইতে পারিবে না। অথচ কাজরীর সুর ওই ভাবকেই এমন একটি চিত্তের ব্যাকুল আবেগে রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছে যে সেখানে যে-কোনো বাঙালীর চিত্তও সাড়া দিয়া উঠিবে।

শিক্ষা এবং সভ্যতায় বাঙালীর সংস্কার হিন্দুস্থানী সভ্যতার সংস্কারের অনেকখানি ওপরে, দ্বিধার সঙ্গে হইলেও এই কথাই যেন বলিতে ইচ্ছা যায়। শ্লীলতা-বোধের মাপ-কাঠিই এই দুইটি প্রদেশে এত ভিন্ন যে, একের নিকট যাহা নিতান্তই ঘরোয়া পরিহাস অন্যের নিকট তাহাই ঘোরতর অপমান। এদেশে সাধারণতঃ যে ভাষায় বন্ধু বন্ধুকে প্রীতিসম্ভাষণ করে সে ভাষায় বাঙলা দেশে শত্রুও শত্রুকে ডাকিতে ভয় পায়। এই কারণেই কাজরী যে এদেশ-বাসীর অন্তরে কতখানি রসানুভূতি জাগায় তাহার ধারণা করা বাঙালীর পক্ষে কঠিন।

কাজরী যাহাদের আনন্দ ও উৎসবের সহায়তা করে, তাহাদের অন্তরটি কোথায় আপনার সার্থকতা চায় ও পায় তাহাই বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই যে নর-নারীর মধ্যে মিলনাবেগ ও ব্যাকুলতা, ইহাকে মানুষ কখনো শিক্ষার দ্বারা পায় নাই বলিয়াই আদিম মানব হইতে সুরু করিয়া শিক্ষিত সভ্য মানুষ সকলের মধ্যেই ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটি নিগূঢ় দুর্নিবার প্রেরণা নর-নারীকে পরস্পরের কাঙাল করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা যে পরস্পরের নিকট কি চায় তাহা স্পষ্ট করিয়া আদিম মানবও জানিতে পারে নাই, সভ্য মানবও জানিতে পারিল না! নর-নারী পরস্পরের চোখের দিকে চায় আর না-জানি কোন্ বিপুল রহস্যের সন্ধান পাইয়া পাগল হইয়া উঠে। পরস্পরকে দেখিয়া এই যে পরম বিস্ময় এটি নর-নারীর মধ্যে জাগিল সর্ব্বপ্রথম তাহাদের যৌবনের উন্মেষে। যৌবন-সমাগমেই কেন এই রহস্যের আকর্ষণ এমন প্রবল হইয়া দেখা দেয় সেই তত্ত্বের আলোচনা এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। তবে দেখিতে পাই এই রহস্তকে বুঝিবার জন্য, স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্যই নর-নারী পরস্পরকে কেবলি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। অন্তর্নিহিত আদিম প্রেরণা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলে, আর কি সে রহস্য তাহাই জানিবার জন্য সে প্রাণপণ প্রয়াস পায়। যাহার যতটুকু দৃষ্টি সে ততটুকুই দেখিতে পায়, সে রহস্তকে সেই সীমার মধ্যেই স্থাপন করিয়া বুঝিবার গৌরবে আপনাকে তৃপ্ত করিতে চায়। কোন জাতি নারীকে কতখানি বুঝিয়াছে কতখানি দেখিয়াছে জানিতে পারিলে তাহার দৃষ্টির দৌড় কতখানি তাহারও একটা নিরিখ পাওয়া যায়।

৭

কাজরীর উপাসকেরা নারীকে কোথায় আসন দিয়াছে, নারীকে কি রকম রহস্য বলিয়া জানিয়াছে?

নারীকে সেও রসমূর্ত্তির এক অপরূপ রহস্য বলিয়াই জানিয়াছে, কিন্তু সে নারীর ততটুকুই দেখিয়াছে যতটুকু দেহের উপকূলে আসিয়া ধরা দিয়াছে। অন্তর্জ্জগতের নারীকে, প্রেমজগতের নারীকে সে জানে না; সে জানে নারীর দেহখানিকে, এই দেহের মধ্যে নারীর যতটুকু উচ্ছ্বসিত উল্লাসে প্রকাশ পাইয়াছে ততটুকুর মধ্যেই সে বিভোর হইয়া গেছে। এইজন্যই নারী তাহার দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য্য ভোগ সম্পদ। শাওনমেঘের আকাশ ভরিয়া ওঠে, আর তাহারও অন্তরে এই সম্ভোগ কামনা তীব্র হইয়া উঠিয়া তাহাকে ব্যথা দিতে থাকে; কিন্তু সে জানে না এই ব্যথার স্বরূপ। তাহার দৃষ্টি নারীকে তাহার দেহের সীমার মধ্যেই দেখিয়াছে, তাই সে নারীর যা আপন স্বরূপ, তাহার যে অন্তরতম রসমূর্ত্তি তাহাকে সে দেখিতে পায় না, শুধু সেই রস-মাধুর্য্যেরই ক্ষীণতম আভাস পাইয়া সে কেমন ব্যথিত হইয়া ওঠে; তাহাই কি তাহার কাজরীর সুরে এমন করিয়া তাহারও অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে?

বোধ করি তাই কাজরীর গানের কথায় পাই কাজরী গায়কের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির পরিচয়। তাই সে কেবলি ব্যর্থ-যৌবনের কথাটিকেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বলে আর কাঁদে; দেহের আকর্ষণ এবং অতৃপ্তিই তাহার সবখানি কথাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। নারীর অখণ্ড ভাবমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টির কোথাও নাই।......

—এই ভরা শ্রাবণে বিরহিনী প্রিয়া তাহার দূর প্রবাসী 'সামলিয়া'কে ওই দাদুরী-পাপিয়ার আকুল সুরে সুর মিলাইয়া কেবলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে, আর বিরহীও তাহার 'পিয়াকে' 'নাই-হর' হইতে ফিরিবার আকুল মিনতি জানাইতেছে! শ্রাবণ রাত্রি যে ব্যর্থ যায়, এই ভরাশ্রাবণে ভরানদীর মত ভরা-যৌবনও যে নিদারুণ বিফলতায় শেষ হইয়া যায়! শ্রাবণ আসিবে বারে বারে আকাশ ভরা মেঘ লইয়া, পাপিয়া-দাদুরীর ব্যাকুল সুর লইয়া; কিন্তু হায় রে এমন মধুর যৌবন এই দেহের কূলে আর আসিবে না, সে চিরতরেই ভাসিয়া গেল!—

২রা ভাদ্র, ১৩৩৩।

জহর

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

হর আমার পর নয়, পরন্তু পরম বন্ধু। এখন তাহাকে আমি সমবয়স্ক বন্ধু বলিতে পারি, কিন্তু সে আমার সমান বয়সী নহে, পাঁচ বৎসরের বড়।—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বয়সের পার্থক্য ঘুচিয়া সমানে দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু একদিন এমন ছিল যখন আমি ছোট ছিলাম, হর বড় ছিল। সে যে বয়সে বড়, তখন এই কথাটা আমাকে জানাইয়া দিবার সুযোগ সে একটিও নষ্ট হইতে দেয় নাই—এমন কি মাঝে মাঝে সুযোগ সৃষ্টি করিয়াও লইত। হয় তো, হঠাৎ তাহার সহিত রাস্তায় আমার দেখা হইয়া গেল; আমাকে দেখিয়াই সে গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল; আঙ্গুলের ইসারায় আমাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া নিঃশব্দে চোখ বড় করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—পালা, পালা।—ত্রস্তনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ভয় পাইয়া পলায়ন করিবার কারণ অদূরে সুদূরে কুত্রাপি উপস্থিত নাই, তথাপি অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিতে লাগিলাম—হরের উচ্চহাসির শব্দ পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে আসিয়া আমার কানের পিঠের উপর লাফাইতে লাগিল।......তখন কিছুই মনে হইত না, হর হাসিল কেন এ.প্রশ্নও মনে উঠিত না; কিন্তু এখন মনে হয়, আমার সে পলায়নের মধ্যে হাসির কারণ যথেষ্ট থাকিত।—আমি চিরকালই ভীরু, এই বত্রিশ্‌ বছর বয়সেও মড়াকান্না শুনিলে আমি দিগ্বিদিকে প্রেতের নৃত্য দেখিতে পাই। হর আমার সেই অকারণ ভয় দেখিয়াই হাসিত।—

হর যখন হাই স্কুলে পড়িত, আমি তখন পাঠশালায় পড়িতাম। হরের সঙ্গে আরও অনেকে পড়িত, তাদের নাগাল আমি কোন দিনই পাই নাই; কিন্তু হরের কথা স্বতন্ত্র।—পরীক্ষা-চক্রের প্রতি দাঁতে বাধিয়া বাধিয়া হর হোঁচট খাইয়া খাইয়া উঠিতে লাগিল; কাজেই, চতুর্থ শ্রেণীতে সে যখন চক্রের তৃতীয় দন্তে ঝুলিতেছে, তখন যাইয়া আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম।

হর বলিল,—বলাই যে?

আমি বলিলাম,—আজ্ঞে, হাঁ।

বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলাম। সেদিন আর নাই, আমরা এখন সমকক্ষ।—

হরের সঙ্গে আমার খুব ভাব হইল।

লেখা পড়ার মত খেলাতেও হর পটু ছিল না, কিন্তু জিতিবার দিকে ঝোঁক্‌ ছিল বেশ।—আমাকে নিজের পক্ষে টানিয়া লইয়া সে জিতিবার সম্ভাবনাকে নিজের দিকে ভারি করিয়া লইত।—

এম্‌নি করিয়া হর আমার অষ্ট প্রহরের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন আমার গুরুজনবর্গ হরের সঙ্গে মিশিতে আমাকে খুব কঠোরকণ্ঠে বারণ করিয়া দিলেন—তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাই মনে হইল যে নিষেধ অমান্য করিলে শুধু মৌখিক ভৎর্সনাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে না।—হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় একদিন তাহাকে লাইব্রেরী-রুমে ডাকিয়া লইয়া যত পারেন বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।......

সেই দিনই একটি ছেলে আমাকে গোপনে বলিল,—হরের চরিত্র খারাপ। জানিস্‌?

আমি শুধু ঘাড় নাড়িলাম।—হরের সহিত আমার

মেলামেশার সংশ্রবে গুরুজনবর্গের সেই দিন্‌কার সেই কঠোর মূর্ত্তির হেতুটা স্পষ্ট হইয়া গেল।……

বেত্রাঘাতের পর হর রাগ করিয়া দু'দিন স্কুলে আসিল না; খেলিবার মাঠেও তাহাকে দেখিলাম না।—গুজব শুনিলাম, সে নাম কাটাইয়া অন্য দেশের স্কুলে যাইয়া পড়িবে।—

ঘটিলও তাই। হর বন্ধু-বান্ধব কাহারো সঙ্গে দেখা না করিয়াই বিদেশে চলিয়া গেল।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বেত মারিয়াছেন, গুরুজনবর্গ হরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—কিন্তু তাহার হেতুটা শুনিয়াও, সত্য বলিতে কি, আমি হরের প্রতি তেমন বীতশ্রদ্ধ হইতে পারি নাই।—বোধ করি, তাহার অপরাধের গুরুত্ব আমি তখন ষোল-আনা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অথবা, এখন সন্দেহ হয়, ঐরূপ অপরাধের বীজ আমারও হৃদয়ের অজ্ঞাত নিভৃত কোণে নিহিত ছিল; সে বীজের অস্তিত্ব তখনই আমাকে চঞ্চল না করিলেও অতি সূক্ষ্ম ইচ্ছার ক্রিয়া গোপনে বোধ হয় চলিতেছিল; কৈশোর যৌবনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।……সৃষ্টিশক্তির অপূর্ব্ব তেজ তখনো আমার রক্তাণুতে সঞ্চিত হয় নাই—তাই সেই নিষিদ্ধ স্থানের অর্থ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই; এবং কেহ ডাকিলে নৈতিক নিষেধের কথা মনে উঠিত না, ইহাতেও এখন আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।—আমার নিজেরই কাজের দ্বারা তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়া গেছে।—যাক্‌ সে কথা।

ভাবিতাম, হর কবে আর কি রকম লায়েক হইয়াই যেন আসিবে!—

কিন্তু দেখিলাম, বছর খানেক পরেই সে না-লায়েক অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিল। বলিল,—থার্ড ক্লাসে উঠেছি, আর কেন? এবার চাক্‌রী ক'রবো।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি চাক্‌রী?

হাসিয়া হর বলিল—চাক্‌রীর নাম ধাম ঠিকানা নিয়ে কি চাক্‌রী খুঁজ্‌তে বেরুচ্ছি! যা জোটে তাই ক'রবো।—

ইহার পর দীর্ঘকালের ছাড়াছাড়ি।—এবং চার পাঁচ বৎসর পরে যখন তাহার সঙ্গে পুনরায় দেখা হইল তখন চুল কাপড় জামা জুতা মোজা চশমার চাক্‌চিক্যে সে একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য।

আমাকে দেখিয়াই সে কলরব সহকারে বলিল,—হ্যালো, বলাই হা ডু ডু?—বলিয়াই আমার চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া বলিল,—বেশ বড়টি হয়েছিস্‌ ত! কি করছিস্‌ আজ কাল?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—সেকেণ্ড্‌ ইয়ারে পড়্‌ছি, রিপণে। তুমি কি কর্‌ছ?

—চাক্‌রী কর্‌ছি, আসাম সার্ভিসে। আর পোষায় না, ভাই; শালাদের বড় অত্যাচার। তা বেশ ভাল আছিস্‌ ত?

—ভালই আছি।

—তোকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়। ভাল কথা, তোর না কি বিয়ে?

—কথাবার্ত্তা ত' চল্‌ছে।

—করিস্‌ নে বিয়ে। বিয়ে মানুষে করে? যদি নিতান্তই করিস্‌ তবে—

বলিতে বলিতে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—খাওয়াবি চল্‌। তখন এসে জুট্‌তে পারি না পারি, খাওয়াটা দিয়েই রাখ্‌।

বাধ্য হইয়া খাওয়াইতে হইল।

আমি রিপণে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িয়া কতদূর কৃতবিদ্য হইয়াছি তাহা না বলিলেও চলে। এইটুকু বুঝিয়াছি যে,

জীবনের লাষ্ট ইয়ার পর্য্যন্ত আমার সেই সেকেণ্ড ইয়ারের বিস্তা টানিতে টানিতে আমাকে এবং আমার ধাক্কায় বহু লোককে হায়রাণ হইতে হইবে; তবে সান্ত্বনা এই যে, লেখাপড়ার সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের সম্বন্ধটা ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। যাক্, পরের কথা পরে হইবে।—

হরের সঙ্গে আবার ছাড়াছাড়ি হইল।

......আমি বিবাহ করিলাম।

সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, সুতরাং ভবিষ্যৎ চন্দ্রালোকিত বারিধিতুল্য উজ্জ্বল, এবং আশা ও সম্ভাবনা ঐ বারিধিতুল্যই কূলহারা সীমাহীন।—জজিয়তী, মুন্সেফী, দারোগাগিরি প্রভৃতির কোন্‌টি আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া নাচিতেছে, তাহা কেউ জানিত না, শ্বশুর মহাশয়ও জানিতেন না—তিনি শুদ্ধমাত্র সেকেণ্ড ইয়ারের ধাঁধায় পড়িয়া প্রাণভরা পণসহ রূপভরা কন্যাটিকে এই হস্তে সমর্পণ করিলেন।—বিবাহের পরই সেকেণ্ড ইয়ারের বেঞ্চগুলিকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইলাম।

ইন্দু বলিল,—পড়া ছেড়ে দিলে?

—দিলাম।

—কি করবে এখন?

—রাজত্ব।

হঠাৎ এতবড় সংবাদটা শুনিয়া ইন্দু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। বিস্তর ডাকাডাকিতেও সে আর সাড়া দিল না। তখন আমার লজ্জা করিতে লাগিল। আমার পাঠত্যাগ-ব্যাপারটা লইয়া লোকে অনুস্বারবহুল যে কথাগুলি বলিতেছে ইন্দুরও কি তবে সেই সন্দেহই মনে জাগিতেছে?—কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন, আমি নির্দ্দোষী। কন্যার বিবাহপ্রদানপ্রার্থী কোনো সম্ভাবিত শ্বশুরকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য আমি সেকেণ্ড্ ইয়ারে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া ছিলাম ইহা সত্য নহে; এবং যে ছেলে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে তাহারই অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ সুবর্ণমণ্ডিত, এই হাস্যকর ভ্রম যদি কাহারও মনে জন্মায় তবে তাহার জন্য তিনিই দায়ী—অথবা তাঁর গ্রহ। তবে ইহাও স্বীকার করি যে আমার পড়া ছাড়ার ভিতরের কারণ যাহাই হোক্ তার বাইরের চেহারাটি প্রবঞ্চকের মতই। কিন্তু ইহাই ভবিতব্য।

......চাক্‌রীর সন্ধানে বাড়ীর বাহির হইলাম।

চাক্‌রীর সন্ধানে বাড়ীর বাহির হওয়া সহজ, কিন্তু বাড়ীর লোক যেখানে নাই, ঘুরিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রবেশ করা কঠিন।

অবশেষে চাকরী মিলিল, ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিলাম, এবং দেড়শত টাকা যখন আয় দাঁড়াইল তখন একদিন স্কন্ধে দৈত্য ভর করিয়া চাক্‌রী ছাড়াইয়া তবে ছাড়িল।

উপরওয়ালা কর্ত্তৃক অপমানিত বাঙ্গালী চাকুরে কে না হয়? লক্ষ লক্ষ ছোট বড় বামুন কায়েত কেরাণী, ভদ্রলোকের ছেলেরা, অহরহ গাল খাইয়া দিব্য কাজ করিতেছে, তোমারই গলা দিয়া সে-টা নামিল না?—অবিচার? অবিচার কি নূতন একটি কিম্ভূতকিমাকার জিনিষ আকাশ হইতে আজ হঠাৎ তোমার সম্মুখে পড়িল যে তাহার চেহারা দেখিয়া একেবারে আঁৎকাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছ? চাক্‌রী না করিলে পেটে যার অন্ন পড়ে না তার এ বদ্-হজমের বাবুয়ানা কেন? কায়েতের ঘরে এত বড় নবাবপুত্র দেখা যায় না যে গাল খাইতে হয় বলিয়া চাক্‌রী ছাড়িয়াছে!—জীবন-লাঙ্গল যে দুটি গরুতে টানিয়া অন্নোৎপাদন করিতেছে তাহাদের একটির নাম চাক্‌রী করা, আর একটির নাম গাল খাওয়া,—মাত্র প্রথমটির দ্বারা যে লাঙ্গল টানাইতে চায় তার মাথা খারাপ।......

হিতৈষীবর্গের কথাগুলি আমি চুপ করিয়া শুনিলাম, এবং হাতে যে সাতশো টাকা ছিল তাহারই কাঁধে জোয়াল দিয়া লাঙ্গল চালাইতে পারা যায় কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

এখন হরের কথা বলি।

ভূতপূর্ব্ব চাক্‌রীর মধ্যেই একটা ছুটিতে চাক্‌রী-স্থান হইতে বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, আমাদের ক্ষুদ্র সহরটি

লজ্জায় ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া দাঁতে জিব কাটিয়া বসিয়া আছে। সকলেরই মুখে এক কথা—ছি ছি ছি! হর যে কেলেঙ্কারী করিয়াছে তাহা বলা যায় না।—

দেখিলাম হর ইতর ভদ্র সকলেরই পরিত্যক্ত; সকলেরই মুখ তাহার বিরুদ্ধদিকে।

আরও শুনিলাম, সে বিবাহ করিয়াছে, আসাম-সার্ভিসের চাকুরী ছাড়িয়াছে এবং বিবাহ ব্যাপারে সে ঠকিয়া গেছে।......হরের শ্বশুর ছুটি কন্যা ক্রোড়ে করিয়া বিপত্নীক হন, দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নাই। লোকের মুখে এই সংবাদ শুনিয়াই অর্দ্ধেক সম্পত্তির লোভে হরের বাড়ীর লোকেরা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভাবী উত্তরাধিকারিণী ছুটি কন্যার একটির সঙ্গে হরের বিবাহ দিয়া ফেলিল—ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা তারা করে নাই, বা করিবার অবসরই পায় নাই।—অবশেষে, অর্থাৎ ব্যাপার সংশোধনের অতীত হইবার পর, জানা গেছে যে হরের যিনি আদত খাশুড়ী তিনি ছুটি কন্যা রাখিয়াই পরলোকগমন করেন, সংবাদের এই অংশে ভুল নাই। কিন্তু শ্বশুর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়পক্ষের আজন্ম-রোগা একটা ছেলেও নাকি আছে – দৈবক্রমে ঐ স্থানটিতেই একটি চুক্ হইয়া গেছে। সুতরাং হরের পরের ধনে পোদ্দার হওয়া হয় নাই।—

এই কারণে হরের মনে পত্নীর প্রতি একটা মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল কি না জানিনা, তবে যে কেলেঙ্কারীর কথা আগে বলিয়াছি তাহার সঙ্গে পত্নীবিদ্বেষের কোনো সম্বন্ধ থাকিতেই পারে না; শ্বশুরের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেক লাভ করিলেও এবং সেই অর্দ্ধেক সম্পত্তি একটা সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক হইলেও সে সে-কাজ করিত।

কেলেঙ্কারীটা ঘরোয়া—

ঘটিতেছে গুরুজন ও পত্নীর চোখের উপর। দু'একজন ইতর শ্রেণীর লোকের নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া যুবতীর নাম লোকের মুখে উঠিতেই হর তাহাকে নিজেরই শয্যার অংশ দান করিয়া তাহার বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইন্দু বলিল,—আহা, বউটার বড় কষ্ট।

ব্যথিত হইলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

ইন্দু বলিল,—শুধু মনের কষ্টই নয়। কায়িক কষ্টও আছে।

—কি রকম? মারে না কি?

—দুজনেই। বউটি ছোট্ট; সারারাত ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে।

কথা ক'টি বলিতে বলিতে ইন্দুর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

হরের চরিত্রদোষ সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু হরচিত্তের এ কলুষ আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। সচরাচর চরিত্রহীনতার যে কাহিনী শোনা যায় তাহার বীভৎসতা এত অসহ্য নহে। কায় এবং বাক্যে প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে আমিও চরিত্রহীন; কিন্তু অসচ্চরিত্রতার যে সীমাটা অতিক্রম করা নিরতিশয় উন্মত্ত বিকারগ্রস্ত অবস্থাতেও আমার পক্ষে সম্ভব হইত না, অধঃপতনের সেই সীমাটাই হর দিব্য সজ্ঞানে অতিক্রম করিয়া গেছে, বাধে নাই; এবং তাহা মুহূর্ত্তের অনিবার্য্য পদস্খলন নহে। ক্রোধে, বিতৃষ্ণায়, ঘৃণায় আমার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল।

ইন্দু আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—বল দেখি কার দোষ?

প্রশ্নটির উত্তর টপ্ করিয়াই দেওয়া চলে না।

যে পুরুষ ও নারী এম্‌নিধারা পাপে লিপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে দোষ কার বেশি, অর্থাৎ কে আগে অগ্রসর হইয়াছিল, বিচারপূর্ব্বক সে সম্পর্কে অপরাধী সাব্যস্ত করা বাহিরের লোকের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই। কারণ স্পষ্ট।—

বলিলাম,—মেয়েটির সম্বন্ধে কুকথা আরো অনেক শোনা গেছে, হরের ইতিহাসও তেমন পবিত্র নয়।

ইন্দু বলিল,—সেইজন্যেই ত' হরের দোষই বেশি। সুলভপ্রাপ্য দেখে সে লোভ সম্বরণ করতে পারেনি'।

আমি বলিলাম,—তা-ই সম্ভব।

কিন্তু এই সুলভে প্রাপ্তির দিকে কে আগে হাত বাড়ায়, সে যে সুলভ এ কথাটা কে আগে প্রচার করে—সে বিষয়ে কোনো কথাই যে একেবারে ঠিক করিয়া বলা চলে না তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি এবং ঐ হরের বাড়ীতেই পাইয়াছি।

অবৈধ প্রণয়ের যা' অবশ্যম্ভাবী ফল এ-ক্ষেত্রেও তাহাই ফলিল—নারী ভাসিয়া গেল, পুরুষের পবিত্রতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। মেয়েটিকে ভাসাইয়া দিয়া সংসার তার কর্ত্তব্য করিল; ক্ষমাপ্রাপ্ত হর পুনরায় বিদেশে বাহির হইল...... ..

আবার যখন হরকে দেখিলাম, তখন সে স্ত্রীপুত্রসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় ভদ্র গৃহস্থ।—দেখা হইল আমারই গরজে। শুনিলাম, হর কলিকাতায় থাকে, আমারই মত সামান্য সম্বল লইয়া একটা কিছু ফাঁদিবার জন্য ঘুরিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা মত্‌লবের উদয় হইল।—

হরকে আমি ভাল করিয়াই চিনিতাম।

সংসারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং সংসারের প্রতি সে অসন্তুষ্ট নহে। তাহার কথায়, তাহার হাসিতে, তাহার ভিতর-বাহির জুড়িয়া এমন একটা নিশ্চিন্ত সহজ সরসতা সর্ব্বদাই বিরাজ করিত যাহা অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসের দাহ জুড়াইয়া দিত।

হর বলিত,—সংসারের গা ঘেঁসিয়া উপরে নীচে দক্ষিণে বামে চতুর্দ্দিকে একটি অগ্নিশিখা অনুক্ষণ জ্বলিতেছে, সুতরাং সংসারে থাকিতে হইলে উত্তাপ গায়ে লাগিবেই; উত্তাপ লাগিলেই অসহিষ্ণু হইয়া হাত-পা ছুড়িতে থাকিলে নিজেই গলদঘর্ম্ম হওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না।—বলিয়া সে হাসিত।

হর ধীর স্থির, পা ফেলে ধীরে ধীরে, কথা কয় ধীরে ধীরে, তাহার কথায় নিহিত অর্থ থাকে না—উচ্চারণ যেমন স্পষ্ট, তার অর্থও তেমনি প্রাঞ্জল......তাহাকে আমার বড় ভাল লাগে। আর একটা কথা—সে পরের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয় না; মতের গরমিল হইলেও তাহা এমনি নিষ্কণ্টক করিয়া প্রকাশ করে যে ক্ষুণ্ণ হইবার অবসরই থাকে না।

আমার বন্ধুগণের মধ্যে শুধু এইসব গুণেই হর আমার প্রিয়তম, অর্থাৎ যে নিজের আত্মগরিমাকে পরের-দেওয়া আঘাতে ব্যথিত করিতে না চায় হর তাহারই মনের মত মানুষ।

তারপর সেই পরমাত্মীয়াঘটিত ঘটনাটা—

আমি ভুলি নাই বা ক্ষমা করি নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই। হরকে দিয়া আমার প্রয়োজনের সম্ভাবনা হইতেই আমার মন ইহাই বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল যে হরের অপরাধের তুলনা নাই সত্য, কিন্তু তাতে তোমার কি? তোমার কোনো অনিষ্ট সে করে নাই। সে এখন অনুতপ্ত কিনা সেটাও দেখা দরকার, নতুবা তাহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। যদি সে অনুতপ্ত হইয়া থাকে তবে তাহার সমস্ত পাপ মনের সমুদয় মলিনতা মুছিয়া গেছে। বিশ্বের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মনে মনে মার্জ্জনা-ভিক্ষার নামই অনুতাপ; বিশ্ব যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকে তবে একা তোমারই সে-কথা মনে রাখা কি উচিত? তারপর—অচেনা কতলোক বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের জীবনের সমস্ত কথা কি জান?—অনুতপ্ত পাপীর সংস্পর্শে আসিলে মানুষ অপবিত্র হয় না।

গোপনে হরকে এক পত্র লিখিলাম—গোপনে অর্থাৎ ইন্দুকে না জানাইয়া। স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতির গরজের বড় ধার ধারে না; তারা যা' চায় হরের যে তা-ই নাই...

হর আমার পত্র পাইয়া মহা আগ্রহে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল; ভরসা দিল, উপায় একটা অবশ্যই হইবে; সে-ও নাকি আমারই কথা ভাবিতেছিল—এমন সময় আমার চিঠি পৌঁছিয়া তাহাকে আশান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

২

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, হর মেঝের মাদুরের উপর

তাহার বিরাট দেহ স্থাপিত করিয়া বসিয়া আছে, টেবিলের উপর ডিজ্ লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

হর অভ্যর্থনা করিল,—এস, ভাই, এস!

তাহার স্ত্রী ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমি প্রবেশ করিতেই সে পাশ কাটায় দেখিয়া হর বলিল,—উহুঁ, কথা কইতে হবে।

হরের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঘোম্‌টা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল,—চা খাবেন কি?

আমি আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলাম,—খাব।

সে চলিয়া গেল।

হরের স্ত্রী চা লইয়া আসিল। তখন তাহার দেহের ও মুখের পানে চাহিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম,—রূপহীন শীর্ণ চেহারা, মুখাবয়ব শুষ্ক। চোখ বড় বড়ই, কিন্তু তাহাতে কোমলতা নাই; রং খুব ফর্সা, কিন্তু মনে হইল, যেন শোভাশূন্য, প্রখর;—হাতের আঙুলগুলি অপুষ্ট সরু সরু, পায়ের পাতার শিরাগুলি যেন আঙুলগুলিকে টানিয়া ধরিয়া শক্ত হইয়া জাগিয়া আছে।

প্লেটের উপর পেয়ালা বসাইয়া সে চা আনিয়াছিল। প্লেটের একটা দিক্ আমি ধরিতেই সে ছাড়িয়া দিল না, ধরিয়াই রহিল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—ধরেছি, ছেড়ে' দিন্।

সে ছাড়িয়া দিল এবং হর অকস্মাৎ ঘর কাঁপাইয়া প্রচণ্ড শব্দে হাসিয়া উঠিল।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—ব্যাপার কি?

অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিলে হর বলিল,—ও-র সঙ্গে আপনি আপনি? আমার বুড়' বয়সের বৌ, আমার ঢের ছোট।

মনে মনে ভাবিলাম, এই কথা! বলিলাম,—আমার কাছে উনি ভদ্রমহিলা—

কথাটি হর আমাকে শেষ করিতেই দিল না; স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সহাস্য কৌতুকে বলিতে লাগিল,—মহিলা! যাক্, এতদিন পরে তোমার গৌরব একটু বাড়ল, মহিলা হ'লে; এতদিন উনিশ বছরের মেয়ে ছিলে, এবার প্রবীণা মহিলা হ'লে।—বলিয়া হা হা করিয়া সে খুব হাসিতে লাগিল। হরের স্ত্রী-ও তা-ই।

আমি একটু বিরক্তই হইলাম।

কথাটা উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীর এই সশব্দ তুমুল হাসি নিতান্তই অশোভন বাড়াবাড়ি বলিয়া আমার মনে হইল।—স্ত্রীর বয়স অল্প ইহাও যেন একটা জাহির করিবার কথা; এবং বন্ধুত্বের অপার ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও স্ত্রীর পক্ষ হইতে পরিচয়ের প্রথমদিনেই আমার দেওয়া সম্মান-গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহাদের সুরুচির পরিমার্জ্জনা সম্বন্ধেও আমি খুশী হইতে পারিলাম না।

যে জন্য আমার আগমন, সে কথাটা সে রাত্রিতে আর তুলিলাম না। পরদিন সকালবেলা তাহার আলোচনা হইল, এবং স্থির হইল যে, হর আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে; কি করিলে ভাল হয়, অল্প মূলধনে অধিক লাভ হয়, ইত্যাদিও বিবেচনা করিয়া দেখা গেল।

হরের স্ত্রী হরকে যে যত্ন-আত্তি তাউত করে তাহার মাত্রা এবং বহর দেখিয়া আমি যেমন আশ্চর্য্য তেমনি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।—স্বামীর সুখ সুবিধা আরাম শান্তির দিকে তাহার কেমন খরদৃষ্টি, স্বামীকে খাওয়াইতে পরাইতে সাজাইতে তার কেমন ব্যগ্রতা!—দেখিলাম, হর স্ত্রীর হাতে নিজেকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে, নিজের হাতে জুতার ফিতাটাও তাহাকে বাঁধিতে হয় না—এম্‌নি সেবা। ভাবিলাম, একদিন এই স্ত্রীর গলাটা হর হাতের মুঠার মধ্যে পায় নাই বলিয়াই সে এখন স্বামী-সেবা করিতে পাইতেছে, নতুবা শুধু জলভরা ঊর্দ্ধদৃষ্টি লইয়াই তাহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত।—এই

স্ত্রীর নারীত্ব এবং পত্নীত্বকে হর একদিন অকথ্য অপমান এবং লাঞ্ছিত করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল।—সেই অমানুষিক অপমান আর লাঞ্ছনা এই নারীটি কি উপায়ে নিঃশেষে বিস্মৃত হইয়া আজ এমন কুণ্ঠাহীন সরল সহজচিত্তে স্বামীকে সেবায় তুষ্ট করিতেছে!—হরও এখন স্ত্রীর গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ; তার স্ত্রীর তুল্য গুণবতী স্ত্রী সংসারে নাই।

হরের স্ত্রীর নাম কুসুম।

হর আহারে বসিলে কুসুম যাইয়া যেন তাহাকে আগলাইয়া বসে—

কত তার আকুলিব্যাকুলি, কত মিনতি, কত অনুরোধ, কত অভিমান;—ঐ তরকারীটার সিকিও ত' খাইলে না, ওটা চাখিয়াই রাখিয়া দিলে, ভাল হয় নি বুঝি?—অমুকটা আর একটু দি?—পেট তোমার ভরে নাই এ আমি তোমাকে বল্‌ছি;—ইত্যাদি সে কত!—আহার শেষ করিয়া হর বাহিরে আসিয়া দেখিতে পায়, আঁচাইবার জল লইয়া কুসুম দাঁড়াইয়া আছে; মুখ ধোয়া শেষ হইতেই গামছাখানা হাতের উপর পড়ে; উপরে উঠিয়া দেখে পানের ডিবাটি লইয়া কুসুম আগাইয়া আসিতেছে; পান কোনোদিন হর কষ্ট করিয়া নিজেই মুখে দেয়, কোনোদিন তাহাকে সে কষ্টও স্বীকার করিতে হয় না, কুসুমই পানটি তার মুখে পুরিয়া দেয়। হরকে শোয়াইয়া, গড়গড়ার নল্‌টি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া, আর কোনো প্রয়োজন আছে কিনা তাহা পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়া তবে সে নিশ্চিন্ত হইয়া ছুটি লয়; এবং স্বামীর পাতে প্রসাদ পায়; যেখানেই থাক্ যে কাজেই থাক্, ডাকিবামাত্র সে ধড়্‌ফড়্ করিয়া ছুটিয়া আসে। হরের পৃথিবী কুসুমময়।

......সর্ব্বশুদ্ধ একটা অনাবিল নিবিড় শান্তির মাঝখানেই তাহারা স্ত্রী-পুরুষে বাস করিতেছে; এবং যে অভাজন তাহার অংশ চায় তাহাকেও তাহারা শান্তির অংশ বণ্টন করিয়া দিতে পারে, ইহাও সর্ব্বপ্রাণ দিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম।

বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে মূলধনের কিয়দংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহাই পূরণ করিবার চেষ্টায় চার দিন পরে বাড়ী আসিলাম; কথা রহিল—মাস খানেকের মধ্যেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে।

৩

মানুষের মন বোঝা যে কত কঠিন, নিস্তরঙ্গ অগাধ শান্তির তলদেশে যে কত বড় কল্পনাতীত বিক্ষোভ আলোড়ন চলিতে পারে তাহা অত্যন্ত অকস্মাৎ আমার চোখের সাম্‌নে পড়িয়া গেল—এই হরের বাড়ীতেই।

শুনিতাম, কিন্তু, ধারণায় বড় অস্পষ্ট হইয়া ধরা দিত যে, নারী নিজের মনটিকে এমন করিয়া লুকাইয়া গোপন করিয়া রাখিতে পারে যে বাহিরে সে-বস্তুটার ছায়াও পড়ে না।—কথাটা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। মূলধন সংগ্রহ করিয়া হরের আশ্রয়ে আবার আসিলাম।

এবার অপরিচয়ের সঙ্কোচ ছিল না—হরের স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলাম,—চা।

চা আসিল, এবং চায়ের সঙ্গে লাভ করিলাম, একটুখানি হাসি। ধাঁ করিয়া একটা চোট্ পাইলাম, কিন্তু হাসিটুকু গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরস্ত্রী সম্পর্কে পাপের বীজ আমার অভ্যন্তরেই ছিল।—

হর বলিল,—কাজ ঠিক করে ফেলেছি, মূলধনের তেমন দরকার হবে না।

আমি ধাক্কা সামলাইয়া হাসি পরিপাক করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম, চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—মূলধন লাগ্‌বে না, সে কি রকম কারবার?

হর বলিল,—একেবারেই লাগ্‌বে না কি আর? তবে অত লাগ্‌বে না।

শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, এবং নিশ্চিন্তচিত্তে পেয়ালার

চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, কুসুম হাত তুলিয়া হরের দিক্‌টা আড়াল করিয়া আমারই দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—দৃষ্টিতে তৃষ্ণা!—

ভাবিলাম, বড় কঠিন সামগ্রী সব পরিপাক করিতে হইতেছে!

বলিলাম,—কাজটা কি ভাই?

হর বলিল,—কাল শুনো, আজ বিশ্রাম কর।

তাহার উপদেশ মানিয়া লইলাম, এবং চা-পান শেষ করিয়া চুরুট ধরাইয়া বাহির হইয়া গেলাম।

মানুষের অন্তরের আলো ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, আশা ও ভাষা প্রভৃতি চোখে প্রতিফলিত হয় ইহা জানি; কিন্তু পরের অন্তরের ঐ সব বস্তুগুলি নিজের অন্তরের বিকৃতিবশতঃ বিকৃত হইয়া চোখে পড়ে কি না ঠিক জানি না।—আমার সন্দেহ হইল, অর্থহীন যাহা তাহারই একটা অসম্ভব অর্থ করিয়া লইয়াছি, এবং সে অর্থ আমার নিজেরই ভিতর দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছে। নিজেকে কঠিন ভাষায় ধিক্কৃত করিলাম বটে, কিন্তু, ভবিষ্যতে একটু সজাগ থাকিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, মনে মনে সেটাও ভাবিয়া রাখিলাম।

পরদিন সকালবেলা হর চা খাইয়া কি কাজে বাহির হইয়া গেল; আমি মাদুর বিছাইয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া পুরাতন খবরের কাগজ পড়িতে বসিয়া গেলাম।—

কুসুম ঘরে ঢুকিয়া অনায়াসে হাসিয়া বলিল,—আপ্‌নি ওর কথা বিশ্বেস করেন?

কাগজখানা কোলের উপর নামাইয়া বলিলাম,—কোন্ কথাটা?

—সে-দিন যে ও বল্‌ছিল, আমি বুড়' হইনি', সেই কথাটা—

—বিশ্বেস করি, তুমি ত' বুড়' হওনি'।

—কি ক'রে জান্‌লেন, আমি বুড়' হইনি'? আমার ঠিকুজী দেখেছেন?

কি বিপদ!—

স্ত্রীলোকের যৌবনের যে-যে লক্ষণ বজায় থাকিলে তাহাকে বুড়' বলা যায় না, সে-কথা এখন আমি বলি কি করিয়া? প্রশ্ন করিয়া আমার মুখ দিয়া কি কুসুম সেই স্পষ্ট ভাষাটাই বাহির করিতে চায়?

চোখ আমাকে নামাইতেই হইল।

কুসুম আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—শুনেছি, আপনি খুব বিদ্বান্, বিদ্বান্ লোক হয়েও আমার সামান্য কথাটার জবাব দিতে পার্‌লেন না?

জবাব একটা মুখে আসিল, কিন্তু চোখ তুলিতে পারিলাম না। বলিলাম,—জবাবটা জানি, কিন্তু দিতে পারছিনে।

—জানেন তা হ'লে?

—জানি বৈ কি।—বলিয়া এবার দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম,—চোখের উপর স্পষ্ট দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া খবরের কাগজখানা আমার কোলের উপর হইতে টানিয়া লইয়া একপাশে ছুড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

আমি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ নহি—কাজেই কুসুমের এই অদ্ভুত আচরণে কেবল বিস্মিত হইবার উপায়ই রহিল না,—চিত্ত অন্ধ হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই কুসুম ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকটেই দাঁড়াইল; আমি বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, এবং অভ্যর্থনার সুরে বলিলাম,—আসুন!

কুসুম যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল—কথাটা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেহ-লতিকা আমার দিকে ঈষৎ নমিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—

আস্‌ব ? কোথায় ?—বলিয়াই ছুটিয়া পলাইল।—সে ছুটিয়া পলায়ন করিল বটে, কিন্তু তার আগেই প্রশ্নের একটি শব্দের উত্তরটা তীব্রবেগে আমার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া হৃদপিণ্ড উন্মত্ত আবেগে লাফাইয়া উঠিয়াছে।—উত্তরটি তার প্রশ্নের ভিতরেই ছিল, সুরের ভঙ্গিমায় ছিল, তার দৃষ্টিতে, তার অবনমিত দেহে ছিল……

বহুক্লেশে কথঞ্চিত শান্ত হইয়া যখন ভাবিবার ক্ষমতা আসিল, তখন মনে হইল, এ কি পরমাশ্চর্য্য !

ঘটনার দোষ-গুণ গুরুত্ব-লঘুত্ব আমার বিচারের বিষয় নহে, কারণ চিত্ত আমার কলুষিত। ভাবিবার কথা শুধু ইহাই যে এই বিস্ময়কর ব্যবহার সম্ভব হইল কি করিয়া ! —যেন দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কুসুম আমাকে এক নিমিষে গ্রাস করিয়া লইতে চায় ; বিলম্ব সহিবার সহিষ্ণুতা তার তিলমাত্র নাই ; ক্ষুধা সহিয়া সহিয়া বালকও খাদ্যের জন্য এত লালায়িত জ্ঞানশূন্য অধীর হইয়া উঠে না।—কুসুমের সঙ্গে আমার পরিচয়ের এই সপ্তম দিন, তাহাও নিরবচ্ছিন্ন নহে, মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এই অত্যল্পকালের পরিচয়ে মনে এমন অদম্য তীব্রতা জন্মিতে পারে তাহা আর যদি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়া থাকে ভালই, কিন্তু আমার সে স্বপ্নাতীত।—উপযাচক হইয়া অবিচলিতভাবে বক্ষলগ্ন হইবার কামনা পর-পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রকাশ করিতে কোন নারী পারে এই সত্যটি যেন আমার চোখের উপর বিদ্যুতের আলোয় দেখা দিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।—এইবার আমি যথার্থই বিস্মিত হইলাম ; অথচ মনের গোপন কোণে একটু খুশীর হাওয়াও বহিল… ..

হর আসিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার বুক ভরিয়া মমতার একটা ঢেউ উঠিল—আহা ! ইহাকেই অবলম্বন করিয়া লোকটা সুখ-শান্তির নীড় রচনা করিয়া নিরুদ্বেগ হইয়াছে !

হরের সঙ্গে কুসুমও উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল। সে হরের পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া জুতা খুলিয়া লইয়া পায়ে চটি পরাইয়া দিল ; হর জামা ছাড়িলে সেটা হুকে ঝুলাইয়া রাখিল ; তাহার হাতের উপর আর-একখানা কাপড় ধরিয়া দিল ; হর বসিলে সে পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল, এবং তামাক সাজিয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আমি বিহ্বলের মত চাহিয়া চাহিয়া কুসুমের এই পাতিব্রত্য দেখিলাম ; দেখিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিলাম মাত্র ; মনের অন্তস্তলে কিরূপ চিন্তার স্রোত চলিতেছে তাহা টেরও পাইলাম না।

হর বলিতে লাগিল,—বড় বড় আপিসে গিয়ে বড়বাবু-গুলোকে ঘুষ দিয়ে হাত করতে হবে, সেই জন্যেই আগাম কিছু টাকা ফেলতে হবে, আর কাজ পেলেই ক্রমশঃ মুল-ধনটা তুলে' নিলেই হবে। বলিয়া সে তুড়ি বাজাইল।

আমি বলিলাম,—বাবুদের হা কতবড় হবে তা অনুমান করতে পার ?

—অন্যায্যভাবে হা বড় করলে আমরা তা' মান্‌ব কেন ? মফঃস্বলের বাজারের সঙ্গে যে-যে কারবারীর সংস্রব আছে তাদের দিয়ে আমাদের দরকার, দেশী হোক্ বিলেতী হোক্। বড়বাবুরা আমাদের যতটা লাভ দিতে পারবেন তত তাঁদেরও লাভ ; কাজেই হিসেব করেই তাঁরা হা ছোট বড় করবেন। অবিবেচক তাঁরা নন্।

—হাটখোলার আড়তদারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে

হবে। যাঁদের খরিদবিক্রীর কাজ তাঁদের সঙ্গেই আমাদের সংস্রব রাখতে হবে।

—এককথায় আমরা দালালী করব।

হর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ঠিক তাই।

আহারাদির পর শুইয়া শুইয়া কুসুমের কথাটাই ভাবিতে লাগিলাম।—বার বার এই প্রশ্নটিই মনে উঠিতে লাগিল, নারী যতই লালসাতুরা হোক, আজন্মের সংস্কারলব্ধ লজ্জা সে প্রিয়পাত্রটির দর্শনমাত্রেই ত্যাগ করিতে পারে না—কুসুম তাহা পারিল কি করিয়া!—

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা ভয়ের আনাগোনা সুরু হইয়া গেল;—মনে হইতে লাগিল, যেন গুরুতর একটা বিপদ অলক্ষ্যে আসন্ন হইয়া আসিতেছে; তাহারই ছায়া যেন আসিয়াছে।—মনেরই দুর্ব্বলতা বলিয়া সে ভয়টাকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও আমার হইল না।

পরদিন কুসুম ঘর ঝাঁট দিতে আসিল।—

কুসুমের দেহ নানা দিকে নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিচরণ করিতে লাগিল; হঠাৎ একবার মুখ ফিরাইয়াই সে বাঁ হাতের উপর ধীরে ধীরে কাপড় টানিয়া পাশ ঢাকিতে ঢাকিতে জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখছেন?

সে অসতর্কতার ভাণও করিল না, কিন্তু আমি লজ্জিত হইয়া তখনি চোখ নামাইলাম। বলিলাম,—কি আর দেখব?

কুসুম মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—হা করে' চেয়ে ছিলেন, আর বলছেন, কি আর দেখ্‌ব? আপনি ভারি—

কথাটা শেষ না করিয়াই সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি ভারি দুষ্ট, অভদ্র, মিথ্যাবাদী, না চতুর?—কুসুম তাহা বলিয়া গেল না, কিন্তু আমার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু আগুন হইয়া রি রি করিতে লাগিল……এতক্ষণ কেমন একটা মোহে তদ্গতভাবে আচ্ছন্ন হইয়া ছিলাম, বুকের ভিতর কি কঠিন বিপ্লব চলিতেছে তাহা অনুভব করিতেই পারি নাই; চোখের আড়াল হইতেই তাদের সুপুষ্ট অবয়ব এবং গৌর আভা যেন আমার বাহ্যাভ্যন্তর জুড়িয়া দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল……

হর আসিয়া বলিল,—মস্ত একটা শিকার মিলেছে হে!

মুখ না তুলিয়াই বলিলাম,—কি রকম শিকার, রাঘব না রুই?

—রুই। একটা মাড়োয়ারী ফার্ম একলক্ষ টাকার হলুদ কিন্‌বে। আমরাও কিছু কিনে দি না, কি বল?

আমি বলিলাম—নিশ্চয় দেব, এমন দাঁও ছাড়তে আছে? ফার্মের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েছ?

—আজ খাওয়াদাওয়ার পর চল যাই, কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাদের রেট্‌ নিয়ে আসিগে।

আমি বলিলাম,—চল।

তৃতীয়দিনে আসিল স্পর্শ—আঙ্গুলের মাথায় মাথায়। চায়ের পেয়ালা আমার হাতে পৌঁছিয়া দিবার সময় প্লেটের নীচে সে আঙ্গুলগুলি এম্‌নি কৌশলে ছড়াইয়া দিল যে তাহাকে স্পর্শ না করিয়া আমার পেয়ালা হাতে লইবার উপায়ই রহিল না……

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া নামা-ওঠার সময় সাম্‌নাসাম্‌নি দেখা হয়, কিন্তু কুসুম পাশ কাটাইয়া দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সরিয়া দাঁড়ায় না।

এম্‌নি করিয়াই দিন কাটে—

কিন্তু বড় সুখে কাটে না। বিষাক্ত রক্ত পরিপূর্ণ

বিস্ফোটক যেমন চৌচির হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তও শান্তি সোয়াস্তি দেয় না, তেম্‌নি একটা অসহ্য জলন্ত প্রদাহ আমার সর্ব্বাঙ্গের রক্তে অনুক্ষণ নির্গমের পথ অন্বেষণ করিয়া ফিরিত।

এম্‌নি করিয়াই দিন কাটে।

একদিন দেখিলাম, কুসুমের মুখখানা বড় ভার ভার।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—বড় ভার ভার যে?

কুসুম বলিল,—ভার? তা' ত' জানিনে, কিন্তু আমার আর সয় না।

স্বর নিস্পৃহ।

—কি সয় না?

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কুসুম বলিল,—এই সংসারের জালাতন। বলিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু কুসুমের কথা আমি বিশ্বাস করিলাম না।—মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় সে আর থাকিতে পারিতেছে না, তার কথায় এই অর্থটাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিলাম; সংসারের জালাতনের কথাটি নিতান্তই মিথ্যা।—কুসুম বুঝিয়াছিল, আমি নির্ব্বোধ নহি, কিন্তু বাহুল্য মাত্রায় সাবধানী।

দেড় মাস কাটিল। ইতিমধ্যে আরও তাগিদ্ পাইয়াছি।

নূতন পাপী আমি; হেটমুণ্ডে পঙ্ককুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িবার দুর্দ্দমনীয় আশঙ্কা আমাকে প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাতে ঠেলিতে থাকিলেও, কেবল নূতনব্রতী বলিয়াই বহুবার আগাইয়া বহুবার পিছাইয়া আমি বহু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম।

মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া লইতে যাইয়াই হঠাৎ এক সময় আমার দৃষ্টি পড়িয়া গেল কুসুমের অন্তরটার উপর। রক্ত আর মাংস ছাড়া আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত করিবার সাধ্য আমার এত দিনের একটি মুহূর্ত্তও ছিল না। আমার মনের আকাশ পিঙ্গল মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল; মেঘ সরাইয়া দেখিলাম, কুসুম আমাকে ভালবাসে না।——

তাহার চোখ্ ঠিক্ তেম্‌নি তৃষ্ণাভরে আমার দিকে চাহিয়া থাকে, চোখে চোখে চাহিয়া তেম্‌নি তার অধর প্রান্তে চাপা হাসির বিজলী খেলিয়া যায়, স্পর্শলাভ করিতে আজও তার তেমনি আগ্রহ——তথাপি, সে যে আমাকে ভালবাসে না ইহাও অভ্রান্ত সত্য।......

মানুষ শুধু স্থূলবস্তুই দেখে না; তুচ্ছতম কারণে অপরের অন্তরের বস্তুহীন যে ছবিটা অদৃশ্য রেখায় ফুটিয়া ওঠে তাহাও মানুষের অন্তর এড়াইয়া একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায় না।—

হরকে কুসুম ভালবাসে না, ভালবাসার অভিনয় করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে—এটা আমার চোখে স্থূল জিনিষ; কিন্তু আমার বেলায় অভিনয়েরও দরকার আছে বলিয়া তার মনে হয় নাই।......

আমার মনে পড়িতে লাগিল,—ছোট ছোট কাজের দ্বারা, সুখ সুবিধা আরামের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখায় যে একটা মনোযোগ, মমতা ও মনোরঞ্জনের অভিলাষ প্রকাশ পায়, কুসুম আমার বেলায় তাহাও দেখায় নাই। —আমার অসুখ করিলে সে দিনান্তে একবার আসিয়া—"কেমন আছেন?"—জিজ্ঞাসা করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে তার অন্তরের ব্যাকুলতার সাড়া যেন পাই নাই।—অনুপস্থিতির পর তার চোখে মুখে দীপ্তি ফুটিতে দেখি নাই; সে বসিয়া খসিয়া পুনর্ম্মিলনের দিন গণিতেছিল না।—স্থূল সূক্ষ্ম সব কথাই একে একে উদ্‌ঘাটিত হইয়া ধরা দিতে লাগিল।——

কুসুম যখন কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া, এমন কি আমার মন না বুঝিয়াই, আমার মনটিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া কেবল দেহের লোভ দেখাইতে আসিয়াছিল, তখনই বোধ হয় আমার মন

তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। অমলিন সাধু নহে বলিয়াই আমার বিহ্বল মন কিছুদিনের জন্য ভাবরিক্তা মাংসপিণ্ডের লোভে ঝুঁকিয়াছিল। কিন্তু শুধুমাত্র দেহের আকর্ষণ যেমন দুর্নিবার প্রচণ্ড তেমনি অচিরস্থায়ী। সুতরাং ভাবের অনুসন্ধানে নিরাশ হইয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় বিকৃতমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ব্যথা অনুভব করিলাম না।

হর বলিতেছিল,—একটা "রানিং কন্সার্ণ" পাওয়া যাচ্ছে, নেবে? দর্জ্জির দোকান, বেশ কাট্‌তি আছে; প্রোপ্রাইটর্‌রা দেখতে শুন্‌তে পারে না বলেই—ইত্যাদি।

......আমি ভাবিতেছিলাম, কুসুমের এই নির্লজ্জ কাম-কলুষিত আচরণের হেতু কি হইতে পারে?—

কুসুম হরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সম্মুখেই বসিয়াছিল; আমি একবার তার মুখের দিকে চাহিলাম।

হেতু কি হইতে পারে?—

প্রশ্নটি আনাগোনা করিতে করিতে সহসা প্রবল একটা হৃৎকম্পনসহ মনে হইল, প্রতিহিংসা?

মনে হইতেই নিজেরই আবিষ্কারের আকস্মিকতায় যেন আমার চমক্ লাগিয়া গেল; কিন্তু সংশয় রহিল না। ইতিপূর্ব্বে কুসুমের আচরণের যে গহনস্থলে প্রবেশ করিতেই পারি নাই তাহাও এক নিমেষেই সুগম হইয়া উঠিল।—

স্মৃতির স্তর খুলিয়া মনে পড়িতে লাগিল—সে যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া অন্ধের মত ঝড়ের মত ছুটিতেছে সেই অশেষ দুষ্কৃতিটাও গোপন করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তার নাই—এম্‌নি তার চপলতা, উচ্চকণ্ঠ।........ দৃষ্টান্তগুলি যেন সহসা দুয়ার খুলিয়া ভিড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল।........পাশের ঘরেই লোক রহিয়াছে, সঙ্কীর্ণ গলি পথের অপর ধারেই আর একটা বাড়ী, পরিচিত লোকই সেখানে থাকে—এ সব জানিয়া শুনিয়াও সে আমাকেই উদ্দেশ করিয়া এমন অনেক কথা উচ্চারণ করিয়াছে যাহার অসদর্থ অনায়াসেই করা যাইতে পারে। "ও কি কর্‌ছেন? ছি! ও সব ভাল নয়"—কথায় এম্‌নি তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার সুর, যেন আমি তাহারই সম্পর্কে ঘৃণ্য অপরাধ করিতেছি; কিন্তু কাজটা খুবই নির্দ্দোষ—হয় ত নিজেরই বইয়ের মলাটের উপর সিগারেটের ছাই ফেলিতেছিলাম।

আমার কাজটা যে না দেখিতেছে সে কেবল তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমাকে অপরাধী করিতে পারে—কুসুম এ-টুকু বোঝে না, এমন অসম্ভব কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই।........লজ্জাস্কর কথাটির প্রচার হোক্ ইহা ছাড়া তাহার আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে?

হর স্ত্রীর প্রতি আজকাল কতটা অনুরক্ত, এবং তাহার উপর কতটা নির্ভর করিয়া আছে, তাহা কুসুমের চাইতে কেহ বেশী করিয়া জানে না।—ইঙ্গিতে কানাকানিতে কথাটার প্রচার হইলে হর সহসা কিরূপ প্রচণ্ড আঘাত পাইবে তাহাও সে অনুমান করিতে পারে না এমন নয়। তবে কি আমাকেই আশ্রয় করিয়া কুসুম তার দানবীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চায়?—গায়ে আমার কাঁটা দিল।

হর বলিল,—শুন্‌ছ আমার কথা?

আমি বলিলাম,—শুন্‌ছি বৈ কি।

—না, শুন্‌ছ না। তুমি তোমার স্ত্রীর কথা ভাব্‌ছ।

—সত্যিই তা-ই ভাব্‌ছি। কি ভাব্‌ছি শুন্‌বে?

—শুন্‌ব।

—ভাব্‌ছিলাম এই কথা, আমার স্ত্রী যদি দৈবাৎ এসে বলে, তোমাকে পেয়ে আমার সাধ পূর্ণ হয় নি', আশা মেটেনি' সুতরাং আমি অমুককে চাই;—আমি তখনই সম্মত হ'য়ে বলি, উত্তম প্রস্তাব, আমার কোনই ওজর তাতে নেই।

হর বলিল,—আজকালকার সব নভেলগুলো পড়ে' ফেলেছ বুঝি?

—হুঁ।

—আমি পড়িনি, তাই আমি ছাড়িনে। সে তার স্বার্থ দেখছে, আমি আমার স্বার্থ দেখব না? আর

এতদিন যে ভালবেসে এসেছি তার কি কোনই মূল্য সম্মান কি দাবি নেই ?

—ভালবেসে এসেছ কই ? ভাল বাস্‌লে কি আর সাধ অপূর্ণ থাকে, না আশ্ মেটে না ?

হাতে হাত চাপ্‌ড়াইয়া হর বলিল,—ভুল, ভুল। ভালবাসার অভাব যেটাকে বল্‌ছ সেটা আর কিছুই নয়—তাঁরই অসহিষ্ণু অসংযত এবং অনুচিত কল্পনা।

—মানে ?

—মানে, অনিশ্চিত সুদূরে ঐ তো অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি—তাঁরা একেবারে দিব্যচক্ষে দেখতে পান্; কিন্তু ঘরের সকল অশান্তির মূল, পুরুষের যে ব্যবহারের নারী-উৎপীড়ন নাম দেওয়া হয়েছে তারও কারণ, ঐ অভাব। ঘরে স্বচ্ছলতা থাকলে অদৃষ্টের প্রতি অসন্তোষ আর অপ্রেম জন্মাবার জায়গাই থাকে না।

—নাটক নবেলে ত' দেখ্‌ছি, যেখানে অভাব উৎপীড়নের কথাও কেউ কখনো শোনেনি' সে রকম বড় বড় ঘরেও—

—ফ্যাসান্, ফ্যাসান্; যাঁরা ওই সব লেখেন তাঁদেরই মনের কদর্য্যতা তাঁরা ফ্যাসান্ করে' চালাচ্ছেন।

আমি বলিলাম, তা' হবে।

কুসুম কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হরের গড়্‌গড়ার উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হর বলিল,—তোমার স্ত্রী ত' সত্যিই আর এসে তালাক্ চায়নি'—তবে আর চিন্তা কি এত ?

—নাঃ, চিন্তা আর কি। তবে কি না ইউরোপে এ রকম কতই ঘট্‌ছে!

—সেখানেও দেখ্‌বে, ঐ এককথা।—সকল অসুখ, অশান্তি, তালাক্, পলায়ন ইত্যাদির মূলে ঐ কাল্পনিক বা যথার্থ অভাব, এবং ফ্যাসান্। সংসারের নারীর ওপর অত্যাচার হ'চ্ছে বলে' যে মনে হ'চ্ছে সে-ও ঐ ফ্যাসান্‌টা চলেছে বলেই। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক লোকটি যদি অবিলাসী হয় আর পেট ভরে' খেতে' পায় তবে পৃথিবীর সাড়ে পনর' আনা পাপ লোপ পেয়ে যায়।—

যায় কি না সে-বিষয়ে একটা ধাঁধার মধ্যেই হরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।......

খোকা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল,—বাবা, মা তোমাকে কাণা বল্‌ছিল।

—কেন রে ?

—মা টেবিলে চুণ পুঁছ্‌ছিল; আমি বল্লুম, বাবা দেখ্‌লে বক্‌বে। মা বল্‌লে, সে দেখ্‌তে পায় না, সে কাণা।

হর বলিল,—সে জানে না, মিছে কথা বলেছে। আমি তাকে খুব বকে' দেব'খন্।......

আমার মনে পূর্ব্ব-প্রসঙ্গেরই ঝঙ্কার চলিতেছিল। বলিলাম,—আমাদের দেশের মেয়েরা যে দলে দলে আত্মহত্যা করছে তার কারণ কি সমাজের অর্থাৎ পুরুষের অত্যাচার নয় ?

হর সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—জান না বোধ হয়, আমার উনিও যে দু' দু'বার চেষ্টা করেছিলেন।

আমি খাড়া হইয়া উঠিলাম। কি সর্ব্বনাশ! তারপর ?

—তারপর আর কি ? মনস্কাম সিদ্ধ হয়নি' তা' ত' দেখ্‌তেই পাচ্ছ।

—কারণ ?

—কারণ উনিই জানেন।

বুঝিলাম, হর গোপন করিতেছে, কিন্তু গোপন করিবার কিছুই ছিল না।......

যে জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া কুসুম নিজের গলায় বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল, সে আগুন এখনো তার বুকে জ্বলিতেছে।

আমার অনুমান তবে ঠিক্......

সেই আগুনে পুড়িয়া কুসুমের কোমলতা, লজ্জা, ভয়, প্রীতি, নিঃশেষে ভস্ম হইয়া গেছে।—

রূপহীনা যুবতী;—

রূপ দিয়া নয়, মমতা দিয়া নয়, প্রীতি দিয়া নয়, শুধু সুন্দর সুপরিপূর্ণ যৌবন দিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, প্রতিহিংসা।......

হরের অতীতকালের সেই নৃশংস উৎপীড়ন এবং অমানুষিক কামুকতার যে স্মৃতি অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের মত কুসুমের বুক জুড়িয়া অনুক্ষণ ধক্ ধক্ করিতেছে, তাহারই অসহ্য তৃষিত লেলিহান্ শিখায় সে হরকেও দগ্ধ করিতে চায়।—কুসুম চায়, একদিন তাহার নিজের জীবন যেমন জর্জ্জর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল, বিষাক্ত মৃত্যুবাণ বুকে বাজিয়া ছিল, হরেরও জীবন ঠিক্ তেম্‌নি দুর্ব্বহ হইয়া উঠুক।—হোক্ স্বামী আজ অনুতপ্ত, হোক্ সে আজ মমতায় গদগদ, স্নেহে অন্ধ, তবু নারী হইয়া পত্নী হইয়া স্বামীর সে পতন সে তিলমাত্র ক্ষমা করিতে পারে নাই। স্ত্রী-স্বরূপে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার অপরাপর কুফল সম্বন্ধে সে নির্লিপ্ত—যৌবনের প্রারম্ভেই অসহ্য বিতৃষ্ণায় যে-জীবন সে স্বহস্তে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে-জীবনের প্রতি, পুত্রের জননী হইয়াও তাহার অণুমাত্রও মমতা জন্মায় নাই।—

* * * *

গাড়ীতে বসিয়া কুসুমের একদিনকার একটি গল্প আমার মনে পড়িতে লাগিল।

সে গল্প করিয়াছিল,—বড় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি কাল।

হর বলিয়াছিল,—কি স্বপ্ন?

—যেন তুমি কাকে খুন করেছ, রক্তের নদী বইছে; পুলিশ বাড়ী ঘিরে তোমায় খুঁজছে।

আমারই দিকে চাহিয়া হর হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল,—ভাই, সাবধান!

অ-নামিকা

নজরুল ইস্‌লাম

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার-বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
তোমারে বন্দনা করি…
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!
তোমারে বন্দনা করি…
নাম-নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালবাসা…
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হ'তে কাঁদ বাসনার অন্তরালে বসি।—
ধরা নাহি দিলে দেহে,
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।

অসীমা! এলেনা তুমি সীমারেখা পারে।
স্বপনে পাইয়া তোমা' স্বপনে হারাই বারেবারে।
অরূপা লো! রতি হয়ে এলে মনে,
সতী হয়ে এলেনাক ঘরে।
প্রিয়া হয়ে এলে প্রেমে,
বধূ হয়ে এলেনা অধরে!
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরীন্ শরাব,
পেয়ালায় নাহি এলে!—
"উতারো নেকাব" *—
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!
সুদূরিকা! দূরে থাক—ভালোবাস—নিকটে আসনা।

তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।—
জন্মজন্মান্তর ধরি' লোকেলোকান্তরে তোমা' করেছি আরতি,
বারেবারে একই জন্মে শতবার করি!
যেখানে দেখেছি রূপ—করেছি বন্দনা প্রিয়া
তোমারেই স্মরি!
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়!
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!
বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি
বারেবারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,
হাওয়া-পরী
প্রিয়া মনোরমা!
ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।
ব্যথা-দেওয়া রাণী মোর, এলেনাক কথা-কওয়া হয়ে!

---

* নেকাব—আব্‌ছা-ঘোম্‌টা

চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা!
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।
বাসনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকেলোকান্তরে!
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে
না-পাওয়ার করি আরাধনা!...
যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি!—
ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে!
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে!
প্রকাশ গোপন
যে-কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা'
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!
তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!

বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি,
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!

যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে আমি আসিলাম।
আমি কাম তুমি হলে রতি,
তরুণ-তরুণী-বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!

কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই!
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় স'রে।
কেন হেন হয় হায়, কেন লয় মনে—
যারে ভালো বাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ
বাসিছে গোপনে।
সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু!
আমারি বধূর বুকে হাস তুমি হয়ে নববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়
তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি-পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,
তুমি মোর প্রিয়ার সতিনী!...

বারেবারে পাইলাম—বারেবারে মন যেন কহে—
নহে এ সে নহে!
কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিম্বা জন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!

কহিবেনা কথা তুমি। আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা!
প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন!
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়,
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়!
চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

* * *

কিন্তু সীতাপতিবাবু সেকথা শুনিলেন।

থানার জমাদার-সাহেবকে সেদিন টুপি-পায়জামা পরিয়াই সরকারী কি-একটা কাজে পাশের গাঁয়ে আসিতে হইয়াছিল, সীতাপতিবাবুর সহিত দেখা না করিয়া তিনি ফিরিতে পারিলেন না। এমন তিনি পথ ভুলিয়া প্রায়ই আসেন।...হাজার হোক্, এ-গাঁয়ের জমিদারটি বড় ভালমানুষ,—অতিথি-সৎকারের চক্ষুলজ্জা আছে......এই কথাটি সাহেবের মুখে বহুবার শোনা যায়।

সীতাপতিবাবু তাঁহার সেই ছোট বাগানটিতে নিজের হাতে কয়েক্ চারা কফি বসাইয়াছিলেন। শীতের সকালে রৌদ্র উঠিতেই কচি কফির পাতায় ঢাকা দিতে হয়। প্রভাতে সেদিন তিনি বাগানে ঢুকিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছোট চারার সবুজ কচি পাতাগুলির উপর বিন্দু-বিন্দু শিশির জমিয়াছে। লেবু-ডালিমের পাতায়-ফলে প্রভাতের রঙিন্ আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল......

বাগানের মাঝে রক্তজবার ফুল ফোটে। পুরানো বেলগাছটায় পাকা-বেলের সুখ্যাতি আশ-পাশের দু'পাঁচটা গাঁয়ের লোকও করে।

অসভ্য এই বুড়ো গাছটাকে কাটিয়া ফেলাই উচিত,—বলিয়া দাদা সেদিন তাঁহাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিটার জবাব এখনও দেওয়া হয় নাই। গাছটি বহু-কালের প্রাচীন। ধরিত্রীর সহিত যাহার এই এতকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়,—খেয়ালের ঝোঁকে একটি দিনে তাহাকে শেষ করিয়া দিতে তাঁহার মন সরে না।

কি বলিয়া যে জবাব দিবেন তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন।

হংস অধিকারী সেদিন বলিতেছিলেন যে, এই গাছে নাকি অনেককালের বুড়া এক ব্রহ্মচারী বাস করেন। পরণে তাঁহার গেরুয়া বস্ত্র,—পাকা পাকা লম্বা দাড়ি! মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতে যেদিন তাঁহার রাত একটুখানি বেশি হইয়াছিল সেদিন বুড়া-বেহ্মচারীর খড়মের চট্‌পটানি তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। বাউল ভট্‌চাজও সেদিন নাকি তাঁহাকে চিম্‌টা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে আকাশ-পথে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে!

এবং সেটি নাকি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পয়মন্ত গাছ।

সীতাপতিবাবু ঠিক করিলেন, চিঠির জবাবে দাদাকে তিনি এই প্রত্যক্ষ সত্য কথাটিই লিখিয়া দিবেন। মিথ্যা একটা অজুহাত দেখাইয়া লাভ কি!

লোহার নাল-বাঁধানো সিপাহী-বুটের তলায় কচি একটি কফির চারাকে মাড়াইয়া দিয়া, জমাদার-সাহেব অনেকক্ষণ হইতেই তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেদিকে সীতাপতিবাবুর নজর পড়িতেই কহিলেন, "এই যে! খবর কি?"

জমাদার-সাহেব কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

"আর দেখ্‌ছেন কি মশাই,—করডাঙায় একটা সিঁদ-চুরি হয়ে গেছে......চৌকিদার-বেটারা সব—"

কথাটা তিনি শেষ করিতে পাইলেন না।

সাহেবের পায়ের দিকে তাকাইবামাত্র সীতাপতিবাবু হাঁ হাঁ করিয়া তাঁহাকে একপ্রকার ঠেলিয়াই ক্ষেত হইতে সরাইয়া দিয়া নিজেও সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

বৈঠকখানার উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "বসুন! তারপর—খবর কি? বসুন।"

বারান্দার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া জমাদার সাহেব কহিতে লাগিলেন, "খবর আর কি! এম্নি

এলাম। বাড়ীর পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি, ভাবলাম—বাবুর খবরটা একবার নিয়েই যাই। আপনার বাড়ীতে চা খেয়ে গিয়ে সেদিন আমি বহুৎ সুখ্যাতি করলাম, বুঝলেন? ফাইন্ চা। 'দার্জ্জিলিং টি' কি আপনার কলকাতা থেকেই আসে?"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "না, না, ও আমি খাই-টাই না মশাই! বাড়ীর সব ছেলেপুলেগুলো খায়, আর এই আপনাদের জন্যেই—এই বাজার থেকে নিয়ে আসা।"

জমাদার-সাহেবের জন্য চা আসিল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ফাইন্...হ্যাঁ, বলছিলাম কি, আপনারা রাজা-লোক, ও আর কতক্ষণ, দিন্-না ও-বেটা পাঁড়েকে একেবারে জন্মের মতন পথ দেখিয়ে,—দিন্-না! তারপর আমরা দেখে' নেব।"

কথাটা তাঁহার বোধ হয় ভাল লাগিল না। ঈষৎ হাসিয়া তিনি কফির চারা ঢাকা দিবার জন্য বাগানে নামিয়া গেলেন।

চা খাইতে খাইতে জমাদার সাহেব আবার কহিলেন, "আপনার ছেলেকেও সেদিন বললাম এই কথা। তাঁর ত' এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখি।"

বাগানের ভিতর সীতাপতিবাবু মাথা হেঁট করিয়া শালপাতার ঠোঙ্গাগুলি কুড়াইয়া জড় করিতে লাগিলেন, প্রত্যুত্তরে অন্যমনস্কের মত আবার ঈষৎ হাসিলেন।

"সেই মুচিবেটার 'কেস্'টা নিয়ে আপনার ছেলে যেদিন গেলেন থানায়, আমিই ছিলাম সেদিন থানার 'ইন্-চার্জ্জ'—নিস্পেক্টরবাবু মফঃস্বলে বেরিয়েছিলেন। ডায়েরীটা খুব খিঁচেই লিখেছি।" এই বলিয়া খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গরম চা-টা তিনি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া একটানে অনেকখানা গিলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর আবার সুরু করিলেন,—"আদালতের সাক্ষী-সবুদ্ ওইখান থেকেই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া গেল। আপনার ছেলে বেশ 'ইন্টেলিজেন্ট্', বুঝ্‌লেন কিনা, বেশ চালাক-চম্বা, বেশ তুখোড়্, খুব ফড়্ফড়ে্'...বুঝলেন কিনা! আপনার ছেলে......হেঁ হেঁ......"

পেয়ালাটি শেষ করিয়া তিনি নামাইয়া রাখিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাহ'লে আসি—নমস্কার।"

সীতাপতিবাবু পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িলেন।

"নমস্কার।"

কিন্তু এই জমাদার-সাহেবটি চলিয়া যাইবার পর তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নবীনকে ডাকাইয়া খুব একচোট্ জোরে-জোরে চীৎকার করিতে লাগিলেন :

"শূয়োর, উল্লুক, পাজি, ছুঁচো, গাধা—সব মাটি করবি দেখ্‌ছি তুই, সব লণ্ডভণ্ড করে' ফেল্‌বি তুই! দাদা যদি শুন্‌তে পায় এ-কথা......। কী দরকার ছিল তোর নেপা মুচিকে নিয়ে থানা-আদালতে নিজে যাবার? ও হ্যাংটা ছোটলোকের সঙ্গে গুণ্ডামি করে কি লাভ হবে তোর শুনি?"

নবীন ধীরে-ধীরে সেখান্ হইতে সরিয়া পড়িল।

নবীন প্রায় অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরেই কাটায়। বাড়ী ঢুকে মাত্র খাবার প্রয়োজনে।

মা সেদিন দুপুরে তাহাকে শুনাইয়া দিলেন,—

"ওরা তোর চোদ্দ-পুরুষের কে, যে ওদের হয়ে নালিশ-মোকদ্দমা করে' বেড়াচ্ছিস্?"

নবীন আধ-খাওয়া করিয়া সেদিনও উঠিয়া গেল। বৌ তাহার রোজ ভাবে যে কথাটা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবে। মেয়ে-ছেলে লইয়া ঘর-সংসার করিতে হইলে পরের দায় নিজের ঘাড়ে চাপানো ভাল নয়, বনের সন্ন্যাসী হয়,—সে এক আলাদা কথা......

কিন্তু তাহাদের দেখাশুনা যখন হয়, রাত্রি তখন অনেক। সবদিন হয়ত ভালও লাগে না।

গাঁয়ের পূব্‌পাড়ায় রাখহরির গোয়ালের পাশে তাহার দাদা বঙ্কিম নিজের হাতেই ছোট একটি ঘর তৈরী করিয়া লইয়াছিল। সংসারে আস্থা তাহার খুব কম। সর্ব্বাঙ্গে ধবল-কুষ্ঠের দাগ। নিজের বুকের উপর বাঁ হাতখানি এবং হাঁটুর উপর ডান-হাত রাখিয়া ডুগি-তব্‌লার পরিবর্ত্তে শরীরটাকে বাজাইতে বাজাইতে বাউলের সুরে সে গান গায়—

"জপ মন ভোলা!
ভোলার দয়া চা'স্ যদি কেউ
সার কর রে গাছের তলা!"

আবার হয়ত তৎক্ষণাৎ সে গানটা থামাইয়া দিয়া মনের আবেগে গাহিয়া ওঠে—

"গাঁজা তোর মহিমা এ কি
আমি দিন-দুপুরে স্বপন দেখি।"

হরদম গাঁজা খায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে,—আর চব্বিশঘণ্টা সেইখানে পড়িয়া থাকে। অপরিচিত কেহ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "নাম—শ্রী বঙ্কিমানন্দ। ওই আনন্দটুকুই যা-কিছু! দেখ না,—অভয়ানন্দ, পরমানন্দ,—সব সিদ্ধপীঠ লোক বাবা! চুরি করলেই চোর, ডাকাতি করলেই ডাকাত, হাওয়াগাড়ী চড়লেই বড়লোক, আর খেতে না পেলেই গরীব।"

রাখহরিকে ডাকিবার জন্য হাবুকে তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নবীন সেদিন সন্ধ্যায় এইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কলিকায় তামাক সাজিয়া আগুনের সন্ধানে বঙ্কিম তখন এদিক্‌-ওদিক্ হাত্‌ড়াইতেছিল, নবীনকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এসো বাবা এসো! বসো বসো!"

নবীন দাঁড়াইয়াই রহিল।

মাথার উপর মাচায় কতক্‌গুলা খড় তোলা ছিল, সেইখান হইতে আঁটি-কয়েক্ খড় টানিয়া লইয়া বঙ্কিম পাশের গোয়ালে চলিয়া গেল। কেরোসিনের কুপিটা সেইখানেই জ্বলিতে লাগিল।

গরুতে-বাছুরে ছাগলে-ভেড়ায় বঙ্কিমের হেফাজতে গোয়ালে প্রায় দশটি জানোয়ার গায়ে-গায়ে বাঁধা থাকে।

খড়গুলি পাইয়া অন্ধকারেই তাহারা হুটোপুটি সুরু করিল।

বঙ্কিম ফিরিয়া আসিয়া কেরোসিনের আলোয় খড়ের একটি নুটি জ্বালিয়া কহিল, "রাখু তোমায় ভায়া বলে, আর আমি বলি বাবা।"

এই বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পর হাসি থামিলে আবার বলিল, "তুমিও বাবা, এও বাবা, সে-ও বাবা, আর সব-চাইতে বড় বাবা হলো গিয়ে—"

সুমুখে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া বঙ্কিম বলিল, "সেই পাগ্‌লা-বাবা ভোলানাথ! দুর্জ্জয় বেটার সাহস কিন্তু! ঘর-দোর্ ছেড়ে-ছুড়ে ছাই-ভস্ম মেখে' সন্ন্যেসী হলো—ঠিক আমারই মতন! বুঝলে নবীন? ওই-বেটাই খাঁটি, আর-সব দেব্‌তা-টেব্‌তা সব ঝুট্!"

হাবু ও রাখহরি দুজনেই আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিল, "কালকার দিনটা কোনরকমে চালাও রাখহরি,—কোথাও কিছু হলো না।"

রাখহরির মুখখানি হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া গেল। বলিল, "তাইত' ভায়া, কাল একটা ভাল উকিল না দিতে পারলে—"

হাবু রায় বলিল, "হরিশ-মোক্তারকে বলে' এসেছি আমি। উকিলের সে কান কাটে। উকিল চাই না, হরিশবাবুকে দিলেই হবে।"

রাখহরি তাহার দাদার সেই ছোট ঘরখানির উপর উঠিয়া গিয়া বলিল, "তারও ত খরচ আছে একটা। আচ্ছা, এসো এসো উঠে' এসো—ভেবে দেখা যাক্।"

নবীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, এখানে আর বসব না। এসো তুমিই এসো।"

বঙ্কিম এক কোণে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, রাখহরি বলিল, "কই দে দেখি দশটা টাকা, কাল-পরশু দিয়ে দেব।"

বঙ্কিম আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল, "টাকা কোথা পাব আমি? আমার ঘর না সংসার, সন্ন্যেসী মানুষ, টাকা কোথা পাব আমি? যার টাকা আছে তাকে বলে বড়লোক, আর যার টাকা নেই—তাকে বলে গরীব।"

রাখহরি রাগিয়া উঠিল।

"রাখ্ তোর ক্যাপামি রাখ্! দিবি ত' দে বলছি দে। নইলে জানিস ত' আমার রাগ,—দেব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে কোন্‌দিন—বুঝবি মজা।"

নবীন ডাকিল, "টাকা ও কোথা পাবে রাখু? এসো তুমি নেমে এসো।"

"তা আমি শুনব কেন হে ভায়া? এই খামারে চব্বিশঘণ্টা থাকে,—রাত-বিরেতে কত টাকার ধান বিক্কি করে তা কে দেখতে যায়? সব জানি আমি সব জানি,—বার কর্ বলছি টাকা বার কর্—তা নইলে তোর ওই উদ্ভট্টি সন্ন্যেসীগিরি আমি ঝেড়ে দেব একদিন।"

এই বলিয়া রাখহরি সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

তিনজনে রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। রাখহরি বলিল, "আছে ভায়া, এক উপায় আছে। সাধু বেনে এই মরসুমে কিছু করে' নিলে। ওকে একবার চেপে ধরলে কিছু বেরিয়ে আসে,—অন্তত কালকের খরচটা—"

"কি করব?"

রাখহরি তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, আজকাল এই ধান-কাটার সময় সাধু বেনে রোজ অন্তত পনর-কুড়ি সের বরবটি ও রমা কলাই নুন-লঙ্কা দিয়া সিদ্ধ করে এবং সেগুলা মাঠে লইয়া গিয়া ধান-কাটা মুনিষ-জনের কাছে বিক্রি করিয়া আসে;—'কম্‌সে কম্' দশ-বার টাকার বিক্রি ত' নিশ্চয়ই! কিন্তু দশ-বারটা নগদ টাকা সে যেমন হাতে পায় না, তেমনি তাহার পরিবর্ত্তে যে-বস্তু সে পায়, আজ-কালকার 'মাগ্‌গি-গণ্ডার' বাজারে তাহার দাম অনেক। এমন-কি পাকা ধানগুলা সে নিজে বহিয়া আনিতে পারে না, তাহার সেই বিধবা মেয়েটা মাঠ হইতে প্রকাণ্ড ধানের বস্তাগুলা মাথায় করিয়া কতবার যে ঘরে রাখিয়া যায় তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নাই। একমাসের জমা বাবদ জমিদারকে অন্তত কুড়িটা টাকা তাহার দেওয়া উচিত।

"চল!"

রাস্তার ধারে ছোট একটি খড়ো-ঘরের বাহিরের দিকে দরজা ফুটাইয়া সাধু বেনে তাহার নিতান্ত ছোট-খাটো ঝাল-মশলার দোকানটি চালায়। দোকানের দরজায় তখন কবাট পড়িয়াছে।

হাঁক্-ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দ হইল।

নবীন ধীরে-ধীরে বলিল, "কাজ নেই রাখু, চল। এর কাছে কিছু হবে না।"

হাবু তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি কহিল, "জরুর হবে। দাঁড়ান।"

সাধু নিজেই বাহির হইয়া আসিল কিন্তু এমন অসময়ে এই এতগুলি লোককে তাহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রথমেই সে একটুখানি ভয় পাইয়া গেল। কালো রঙের শীর্ণ দুর্ব্বল বাঁ-হাতের দুইটি আঙুলের ডগায় ধরিয়া কেরোসিনের যে জ্বলন্ত কুপিটি সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সেটি সে তাহার চৌকাঠের উপর ধীরে-ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সকলকে একটি করিয়া প্রণাম করিল; হাত জোড় করিয়া বলিল, "কি হুকুম আজ্ঞে?"

কাঁচা-পাকা গোঁফগুলা তাহার মুখের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নীচের-পাটির উঁচু দাঁতদুটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই, অন্ধকারেও সে দুটি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠে কলাই বেচে' পয়সা-কড়ি আজকাল নাকি বেশ পাচ্ছ শুন্‌ছি—"

সাধুকে শীত একটুখানি বেশি লাগিতেছিল, গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটার উপর কোঁচার খুঁটটা টানিয়া লইয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বলিল, "বেশি আর কোথা আজ্ঞে, বাপ্-বেটিতে সারাদিন খাটি,—আনা-আষ্টেক হয়

রোজ।—পয়সাই ত' সব আজ্ঞে, সংসারে পয়সা বিনে আর কি আছে বলুন?"

কপালের উচু হাড়ের নীচে দুইটা গর্ত্তের ভিতর হইতে নিতান্ত ছোট এবং উজ্জ্বল চোখ দুইটা তাহার সেই কেরোসিনের কুপির আব্ছা-অন্ধকারেও ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। মনে হইল যেন সে এই দুইটা চোখের দৃষ্টি দিয়া দুনিয়ায় একমাত্র পয়সা ছাড়া আর-কিছুই দেখিতে পায় নাই।

রাখহরি বলিল, "জমিদারকে জমা লাগবে সাধু, জমা না দিয়ে তুমি কলাই বেচ্‌তে পাবে না। রোজ আট-দশ টাকার ধান—এ কি মুখের কথা বাবা?"

হাবু বলিল, "ধান কেউ নিজের মাঠের দেয় না তা আমি জানি। পরের মাঠের আঁটি ঝেড়ে' তোমার বস্তা বোঝাই করে' দেয়—আর তুমি তাই নিয়ে এসো ঘরে! সব চুরি—বাবা সব চুরি!"

কথাটা সত্য। সাধু বেনে বেশ একটুখানি ঘাবড়াইয়া গেল। ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মুখে কোনও কথা না বলিয়াই সে তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া নবীনের কাছে তাহার সেই কঙ্কাল-সার হাতখানা বাড়াইয়া বলিল, "ধরুন!"

সাধুর হাতখানা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বলিল, "আপনার পান খেতে এই যা দিচ্ছি—আজ্ঞে এই...... আনা-চারেক্......"

রাখহরি বলিল, "আনা-চারেক্ কি রে বেটা? আনা-চারেক্ কি?"

হাবু আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না।

নবীন চীৎকার করিয়া উঠিল—

"হারামজাদা, পাজি,—চোর-কাঁহাকা! চল্—দেখি,—চুরি করা কত ধান আছে তোর ঘরে, এক্ষুনি চালান্ দেব থানায়। চল্—"

রাখহরি ও হাবুকে লইয়া সুমুখের খোলা দরজা দিয়া হুড়মুড় করিয়া নবীন তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সাধুর হাত হইতে কেরোসিনের ডিবেটা একপ্রকার কাড়িয়া লইয়াই রাখহরি সর্ব্বাগ্রে ভিতরের চালার দিকে আগাইয়া গেল।

চালার একপাশে পাকা ধানের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ দিনে-দিনে জড় হইয়াছে। রাখহরি সেদিন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিল। বলিল, "দেখে যাও হে, দেখে যাও বেটার কাজ দেখে যাও।"

গাদা হইতে একমুঠা ধান তুলিয়া লইয়া আলোর কাছে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে হাবু বলিল, "এ যে বাবা আমারই মাঠের সিঁদুরমুখী ধান! এ যে 'চিন্‌বস্ত' সাধু! তুমি আর যাবে কোথা বাবা?"

রাখহরির আর বিলম্ব সহ্য হইল না। সাধু তখন উঠানের হিমে বসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "চল, চৌকিদারের জিম্মে করে' দিয়ে আসি তোমাকে চল।"

এতক্ষণে মনে হইল যেন সাধুর বিধবা মেয়েটা পাশের একটি ছোট ঘরের খিল খুলিয়া অন্ধকার চালায় আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিল, "রাখু, হাবু, চলে' এসো তোমরা,—আমি দেখে নেব এরপর।"

তাড়াতাড়ি উঠানটা পার হইয়া সে বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল।

অন্ধকার উঠানের উপর একেবারে হামাগুড়ি দিয়া সাধু তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"দেখে শুনে একটি আধুলি বাবু এই আমি আপনাকে দিচ্ছি পান খেতে—গরীব লোক বাবু, মাপ করুন আপনি......"

পান খাইবার জন্য আর বেশি যে উঠিবে না নবীন তাহা জানিত। পা দুইটা তাহরি ছাড়াইয়া লইয়া সে বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখহরি কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয় তাহ'লে ভায়া, কি হবে?"

পথ চলিতে চলিতে নবীন বলিল, "কি হবে তা আমি কি জানি?"

হন্ হন্ করিয়া সে আরও খানিকটা আগাইয়া গেল।

"এখানে আসাই যে আমার উচিত হয়নি।...এমনি ছ্যাচড়ামি করে' আমি যার-তার কাছে আদায় করে' বেড়াই, আর তুমি বসে' বসে' মোকদ্দমা চালাও। ভারি যেন আমারই গরজ!"

হাবু ও রাখহরি দুজনেই তাহার পিছু-পিছু আসিতেছিল।

নবীন আবার বলিল,—

"মোকদ্দমা তোমায় চালাতেই হবে রাখু, তা সে তুমি যেমন করেই চালাও। যাও তুমি যাও, আর এসোনা, টাকার চেষ্টা দেখগে।"

"তাই দেখি ভায়া"—বলিয়া রাখহরি ফিরিল।

হাবু ফিরিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিল।

নবীন তাহাকে সঙ্গে ডাকিয়া লইল। স্যাক্‌রাদের ঘরগুলা পার হইয়া আসিয়া নবীন বলিল, "তোমার ভয় নেই হাবু, তোমাকে মোকদ্দমা আমি নিজে করিয়েছি। দিন কবে পড়েছে বল্‌লে?—পরশু, নয়?"

হাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ পরশু। কিন্তু আমি ভয় করি না দাদাবাবু,—আমি সে ছেলেই নই।"

"আচ্ছা, বিনোদ কুলুকে দিয়ে যে দু'নম্বর করিয়েছ, সে-দুটোর দিন?"

"তার এখনও অনেক দেরি। পঁচিশে।"

"রত্না বাগ্‌দিকে দিয়ে যেটা করালে, সেটা বুঝি পনেরই?—হ্যাঁ, ও-সব আমার মনে থাকে না হাবু, দুএক দিন আগে থেকে মনে করিয়ে দিও।"

হাবু ঘাড় নাড়িল।

"আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, নেপাল যে অসুখে পড়লো, সে কি সেদিন ওই-ব্যাটার মার খেয়েই, না ও-অসুখ ওর আগে থেকেই ছিল?"

হাবু বলিল, "মার খেয়ে ত' নিশ্চয়ই।......অসুখ আবার আগে থেকে থাকে কখনও?"

দুজনেই নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

আকাশে তখন পঞ্চমীর চাঁদ উঠিতেছে।

নবীন কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হাবুর দিকে মুখ ফিরাইতেই সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল তাহার বগলের নীচে কি যেন একটা ঝকৃঝকে' হাতিয়ার লুকানো রহিয়াছে। বলিল, "এ কি? এ কি জন্যে হাবু?"

হাসিতে হাসিতে কাঠের বাঁট-দেওয়া ধারালো ইস্পাতের টাঙ্গিটি সে তাহার গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করিয়া নবীনকে দেখাইল।

"এক এক চোটে দু-দু'টো মানুষ।...এ না হ'লে কি আর বেরোবার জো আছে আজকাল। দুষমণ সব আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আপনিও একটা রাখুন, বুঝলেন?"

এত রাত্রে বাক্সের চাবির যে কি প্রয়োজন নবীনের স্ত্রী তাহা বুঝিল। বলিল, "না, চাবি আমি দেব না।"

নবীন বলিল, "অবিশ্বাস করছ?"

স্ত্রী তাহার ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "আ!— কি বিশ্বাসের লোকটি গো,—সাধু স্যাওড়াগাছ!"

নবীন বলিল, "দাও। আবার দেব।"

"হ্যাঁ, তা আবার দেবে না! দিয়েছ যে কত!"

নবীন মিছামিছি একবার বাক্সর কাছে আগাইয়া গেল। স্ত্রী তাহার বাক্সটার উপর একেবারে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং উপুড় হইয়া দুই হাত দিয়া সেটাকে আগ্‌লাইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না, না দেব না, না।...... আমায় খুন কর, তারপর নিয়ে যাও, মার, যা খুশী তাই কর।"

নবীন সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া তাহার বিছানায় গিয়া শুইল। বলিল, "বেশ। দেবে না তাই বল, অত কথায় কাজ কি?"

"না, দেব না। পরের জন্যে আমার গায়ের রক্ত দিতে পারব না—পারব না।"

বাক্স ছাড়িয়া বৌ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আমার হাড়ে হলুদ দেবে, পরের দায়ে আমার সব যাবে—সব যাবে। মা গো মা, এমন লোক ত' কোথাও দেখিনি মা, এর চেয়ে আমায় কেটে-কুটে' নদীর জলে ভাসিয়ে কেন দাওনি মা!" বলিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না সুরু করিল।

নবীন আর একটি কথাও বলিল না। ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল কিছুই টের পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিতেই সর্ব্বপ্রথমেই বৌ-এর নজরে পড়িল—তাহার বাক্স খোলা!

নবীন কোন্ সময় উঠিয়া চলিয়া গেছে। মেয়ে দুটো তখনও ঘুমাইতেছিল।

বৌ-এর গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল......

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

চয়নিকা

নোগুচি

শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নোগুচি জাপানের কবি। জাপানের কবি—এই কথাটার একটা বিশেষ মানে আছে, সেটা আগে বলা একান্ত দরকার। জাপানী কবিতার ভিতরের কথা বুঝলেই নোগুচির কবিতা বোঝা যায়। জাপানের কবিতার সমস্ত বিশেষত্বগুলি তাঁর লেখায় বিশেষ ভাবেই পাওয়া যায়।

রিকিউ প্রাচীন জাপানের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপতান্ত্রিক কবি। একদিন তাঁর গৃহে কোনও কবি-বন্ধু আসার উপলক্ষে তিনি তাঁর ছেলেকে বাগানের পথ পরিষ্কার করে রাখতে বলেন। ছেলে ঝাঁট দিয়ে বাগানের সমস্ত রাস্তা থেকে শুকনো পাতা আর কাঁকর, যত কিছু আবর্জ্জনা, সব কিছু দূর করে রিকিউকে এসে জানায়, পথ পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। রিকিউ দেখে বলেন,—হয় নি, পথ এখনও পরিষ্কার হয় নি।

ছেলে আবার ঝাঁটা নিয়ে পথ পরিষ্কার করে। রিকিউ তবু বলেন, পথ এখনও পরিষ্কার হ'ল না। হতাশ হয়ে ছেলে শেষবার চেষ্টা করে। পথে কোথাও এতটুকুও আবর্জ্জনা থাকে না। তবু রিকিউ-এর মন সায় দেয় না। তখন তিনি স্বয়ং এগিয়ে এসে বলেন, দেখ, আমি কেমন করে এবার পথ পরিষ্কার করি।

তখন অস্ত-রবির রক্ত-আলো মাপেল গাছের পাতার কোলে কোলে মরণের স্বপ্ন বিছিয়েছে।

রিকিউ ধীরে ধীরে পথের ধারের মাপেল গাছের তলায় এসে গাছগুলি নাড়া দেন। পথের উপরে ছিন্ন সূর্য্য-কিরণের মত মাপেল গাছের শুকনো সোনালী পাতা ঝরে ঝরে পড়ে। রিকিউ বলেন, এবার পথ তৈরী হ'ল; এই শুকনো পাতার শুভ্র পথে বন্ধু আসবে।

রিকিউ-এর এই জীবন-কাহিনী থেকে জাপানী কবিতার অন্তরের কথা বোঝা যায়। জাপানী কবি ও দার্শনিকরা জীবনকে, আমরা যাকে বলি ঠিক উল্টা দিক, সেই দিক দিয়ে দেখেছেন।

জীবনকে তাঁরা বুঝেছেন মৃত্যুর মাঝখানে গিয়ে। তাই বিরতির সুরে তাঁরা তাঁদের বীণাকে বেঁধেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে চরম বিরতির মধ্যে গতিই প্রাণ হয়ে, রূপ হয়ে রয়েছে।

তাই বিরতির গানের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গতিকে স্বীকার করেছেন, তাকে বন্দনা করেছেন। তাই জাপানের কাব্যের আকাশে যে প্রাণ-বিহঙ্গম চলে, তার চলার শব্দ নেই, সে নক্ষত্রের নিঃশব্দ উদয়ের সুরে বাঁধা; সেখানে জীবনের যে অমৃতবাহিনী বহে সে বহার আনন্দে নির্বাক।

জাপানী কবি কথাকে ততখানি শ্রদ্ধা করেন যতখানি অন্তরের অস্ফুট বাসনাকে বোঝাতে পারেন। তাঁরা বেশী কথার সার্থকতাকে বিশ্বাস করেন না। কথা শুধু অন্তরের বাসনার প্রতীক। প্রতীককে তাঁরা ততটুকু চান যতটুকু পেলে সে-প্রতীকের অতীত বিরাটকে অনুভব করতে পারেন। তাই জাপানী কবিতায় কথার পরিসর অতি পরিমিত। তাই সেখানে অভিনব হক্কু কবিতার জন্ম হয়।

নোগুচি তাঁর কোনও কবিতায় বলেছেন যে—

গান গাওয়া শেষ হল; একটি মুহূর্ত্ত…
এই যে আমার গানের ভাষা, সে ত শুধু দেহ (হায়, দেহ মরে যায়)
আসল গান আমার গানের অন্তরাত্মা, সে দেহাতীত; গান গাওয়ার শেষে নিঃশব্দতার প্রাণ-তরঙ্গে তার চির-কমলাসন পাতা…
বসন্ত চলে যায়! (গোলাপে আর কোকিলে যে বসন্ত, সে মরে যায়, সে ত শুধু বসন্তের আবরণ!)
আজ প্রকৃতির প্রতি-ছায়ায় আমার অনন্ত বসন্ত দোলে, নিঃশব্দে…

তাই নোগুচির কথায় বলতে হয় যে, জাপানে প্রত্যেক কবির সঙ্গে কবি-পাঠকও জন্মায়। কেননা জাপানী কবি যতটুকু কথা বলেন, তার বেশী ইঙ্গিত করেন। সেই ইঙ্গিতের ভাষা বুঝতে হলে মনকেও তৈরী করতে হয় তারি অনুযায়ী। জাপানী কবি কোনও কিছু বোঝাবার জন্যে কবিতা লেখেন না। আকাশের তারার উদয়ের মত, রজনীগন্ধার বিকাশের মত, নদীর গতির মত সে শুধু বলে, আমি আছি। চাঁদ আর তারার মত সেও এক প্রকৃতির সৃষ্টি! হয় ত পর-জন্মে সে-ই তারা হয়ে জন্মাবে—হয় ত পূর্ব্ব-জন্মে সে-ই ছিল নির্জ্জন বনের বুকে রজনীগন্ধার নিশীথ-গন্ধে!

নোগুচি সেই কথাই এক কবিতায় বলেছেন,

"ফুল হয়ে ফুটে উঠি, বা কবি হয়ে জন্মাই
সে শুধু প্রকৃতির খেয়াল!..

"It's accident to exist as flower or a poet;…
To be a poet is to be a flower,
To be the dancer is to make the singer sing."

আমরা সাধারণত জীবনের যে দিকে ফিরে চাই না, জাপানী কবি তারি মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন। এই বস্তুর জগতের সঙ্গে আমাদের এত বড় একটা প্রয়োজনের সম্বন্ধ গড়ে তুলেছি যে, প্রয়োজনের অতীত যে বিরাট অন্তর্জগৎ রয়েছে তার বিষয়ে আমরা একান্ত উদাসীন। আমাদের জীবনে রাত্রি শুধু অলস নিদ্রা নিয়ে আসে—ধ্যানের স্বপ্ন আনে না। আমাদের আকাশে যে নক্ষত্র ওঠে সে শুধু জড়পিণ্ডের মত প্রয়োজনের পৃথিবী থেকে দূরেই থাকে—অনন্তের নিত্য নিশীথ-ইঙ্গিত জীবনে পৌঁছে দেয় না।

জাপানী কবির কাছে নিষ্প্রয়োজনীয়তা এক অপূর্ব্ব সত্তা পরিগ্রহণ করেছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, নিষ্প্রয়োজনীয়তার গূঢ় অন্তর্লোকে প্রয়োজনীয়তা সুপ্ত হয়ে আছে। তাই তাঁরা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন চরম নিষ্প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে। নোগুচি এই প্রসঙ্গে এক

জায়গায় বলেছেন যে, আমাদের এই নিষ্প্রয়োজনীয়তার কাব্য—সে নিশীথের শঙ্খধ্বনি। যে ঘুমিয়ে রইল তার কাছে এই শঙ্খধ্বনির কোনও অর্থ নেই, কিন্তু যে জাগ্রত মনে সেই শব্দকে গ্রহণ করল, হয়ত জীবনে তার সেই মুহূর্ত্ত চরম প্রয়োজনীয় রূপ ধরে উঠল।

সুন্দরের অন্তরে জীবনকে জাগ্রত কর্‌বার একটা বিরাট ইঙ্গিত আছে, সে ইঙ্গিত মরমীর নিকটেই ধরা পড়ে। সুন্দর আপনি কিছু ব'লে না।

আকাশের তারাকে কে বোঝাবে? কে বোঝাবে কেন অকারণে সহসা জীবনের অন্তরঙ্গ সায়রে চাঁদ দোলা দেয়? কেন ঢেউ ওঠে মনে? জাপানের কবি শুধু বলেন, ওই তারার মত আমার এই কবিতা, ওই একটু জ্যোৎস্নার মত আমার এই এক টুকরো কথা…তুমি কি হাসলে, তুমি কি কাঁদলে, তুমি কি জীবনের দিশা পেলে, সে তুমিই জান!

তাই নোগুচি গেয়েছেন,—

"Our Song is not of a city's fall
No laughter of a kingdom bids our feet wait ;
Our heart is away with sun, wind and rain,
We the shadowy roamers of the holy high
way."

প্রয়োজনীয়তার গর্ব্বে আমরা অনেক সময় এই স্বপ্নকে অলস ব'লে উপেক্ষা করি। আমরা ভুলে যাই যে এই মৌনতা এই ধ্যানই সৃষ্টির বীজকক্ষ।

প্রয়োজন ও নিষ্প্রয়োজনের অতীত সেই বিরাট সুন্দরের ধ্যানে জাপানী কবি যে পূজার আয়োজন করেছেন তা নিতান্ত অনাড়ম্বর। তার ধ্যানমন্ত্রও একান্ত একাক্ষরা। জাপানী কবি আকাশকে দেখেছেন একটি ক্ষুদ্র নিঃসঙ্গ তারার কম্পনে; একটি আলোর স্পন্দনের অন্তরালে নিখিলের আলোক-পাথারের দিশা পেয়েছেন; একটি ফুলের বিকাশের মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত জটিল রহস্যকে দেখেছেন। তাই সে দেশে কাব্যের সৃষ্টি-সভায় বহুর জনতা নেই, সেখানকার নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছে শুধু একটি ফুল, একটি তারা, শুধু একটি ভীরু কথা।

আমরা জীবনকে আর একটি বৃহত্তর জীবনের মধ্য দিয়ে দেখেছি, কিন্তু জাপানী কবি জীবনকে দেখেছেন একটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তের মধ্য দিয়ে। সেই মুহূর্ত্তের জয়গানে তাঁর কাব্যের সৃষ্টি। আমাদের কাছে আকাশ বিরাটের প্রতীক; জাপানী কবির কাছে একটি শিশিরবিন্দুই বিরাটের প্রতীক। ভারতীয় কাব্য ও জাপানী কাব্যে তাই ভাবগত কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই বিরাটের উপাসক।

জাপানী হক্কু-কবিতা সেই কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। হক্কু মানে—শুধু একটি কথা কিংবা শুধু একটি স্বীকারোক্তি। তার দেহ অত্যন্ত পরিমিত, একটি ক্ষুদ্রতম শিশিরবিন্দুর মত। হক্কু কবিতার সমালোচনায় নোগুচি বলেছেন, এ যেন একটি ক্ষুদ্র তারা; তারই জ্যোতির স্পন্দনে সমস্ত বিরাট আকাশ ধরা পড়ে আছে। সে যেন ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বার, অন্তরাল দিয়ে যার বিরাট দিগন্তরের ছবি ফুটে ওঠে।

যেটুকু এর কথা তা নিতান্ত অল্প, কিন্তু সেই অল্প কথার অন্তরালে ভাষার অতীত সমস্ত ভাবনার ইঙ্গিত তারই মধ্যে ওতঃপ্রোত আছে। মরমীর কাছেই ইঙ্গিতের সেই নীরব ভাষা ধরা পড়ে। হক্কু কবিরা বলেন যে, মানুষের কথা কোন দিনই তার ভাবকে পরিপূর্ণ মাত্রায় ফোটাতে পারে না। মানুষের ভাষার চেয়েও মানুষের ভাবনার পরিসীমা ঢের বড়, ঢের দীর্ঘ, তাই ভাষার ধাতুগত অর্থ জাপানী কবির কাছে নিতান্ত অল্প। জাপানী কবির কাছে শব্দ ও ভাষা প্রকাশের শুধু একটি দিক মাত্র, আর একটি দিক হচ্ছে নীরবতা এবং এই দিকটি জাপানী কবির কাছে গভীর ভাবে দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের গর্জ্জনের পর নিঃশব্দতার শব্দে যে মৌন ভাষা জেগে ওঠে, জাপানী কবি সেই ভাষার অতি নিকট আত্মীয়।

দিনের সহস্র মুখরতা তার কানে কোন কথা বলে না,

রাত্রির নিঃসঙ্গ তারা কথার অতীত কথা তার মনে জাগিয়ে তোলে। নোগুচির কোনও কবিতায় এই কথাই দেখি। তিনি বলেন,—

পাখীর গান প্রাণ দিয়ে শুনি,
তার কণ্ঠস্বরের জন্য নয়, গানের পর যে মৌনতা
জাগে তারই জন্য।
শব্দের সমুদ্রের কল্লোল থেকে হে নবজাগ্রত
কুমারীর নিঃশব্দতা !
আমার এ মন ফুলের মতন, তোমার আসার
পথের দিকে চেয়ে আছি।
সূর্য্যকে আমি ভালবাসি, সে আলোর
জন্য নয়,
আলোর অন্তরালে যে ছায়ার স্বপ্ন পড়ে
আমি তারই উপাসক কবি।

তাই হক্কু কবিতা বুঝতে গেলে পাঠকের মনকে অনেকখানি সজাগ হতে হয়। কথার অন্তরালে যে কবিতার অবকাশ থাকে তা আপনাদের মনের কল্পনা ও ধ্যান দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হয়, নইলে হক্কু কবিতা পড়তে যাওয়াই বৃথা।

"Oh, how cool ··
The sound of the bell
That leaves the bell itself."

এই হক্কু কবিতাটির কথার অন্তরালে অনেক কথা না-বলা হয়ে আছে। কবিতাটিতে সময়ের কোন কথা নাই, কিন্তু একটি চমৎকার ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিত তারই কাছে ধরা পড়ে যার ইন্দ্রিয় বহুবার সজাগ হয়ে দিবসে ও নিশীথে শব্দের পশ্চাতে ফিরেছে। তাই সে অন্ধ হলেও শব্দ শুনে বলে দিতে পারে যে নিশীথ, না মধ্যাহ্ন; সন্ধ্যা না উষা। ঘণ্টার শব্দ এত [illegible] এত নিঃসঙ্গ যে, স্পষ্টত ঘণ্টার সঙ্গে তাকে পৃথক ভাবে দেখা যায়। [illegible] এ সামান্য কথাগুলির অন্তরালে একটি সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে—নিস্তব্ধ জগৎ, অরণ্য নির্ব্বাক, আকাশে নিশীথের খেয়াশ্রান্ত জীর্ণ চাঁদের ভেলা, দূরে নিঃসঙ্গ একটি তারার পক্ষ্মস্পন্দনে শিশির ঝরে, মুদিত প্রভাতের স্তিমিত আলো—সেই সময় মন্দিরের শঙ্খ বেজে ওঠে, উদাস, বিরাট অনন্ত-প্রসারী......

নোগুচি স্বয়ং একজন হক্কু কবি। তিনি বহু হক্কু কবিতা রচনা করেছেন। হক্কু কবিতা হিসাবে সেগুলি অপূর্ব্ব।

"Where the flowers sleep,
Thank God ! I shall sleep to night.
Oh come butterfly !"

কবির মন ফুল হয়ে ওঠে, তাই বলে :—

আজ যেখানে ফুলেরা ঘুমোল, সেখানে আমারও শয়ন
পাতা হলো। তুমি ধন্য !

ফুলের নিদ্রার অন্তরালে কখন্ তার অন্তরমধু তার বন্ধু এসে লুণ্ঠন করে' তাকে সার্থক করে, তাই সে বলে, "হে বন্ধু, হে প্রজাপতি, তুমি এসো।"

"Fallen leaves ! Nay, spirits ?
Shall I go downward with thee
Long a stream of Fate ?"

শুক্নো পাতা ঝরে পড়ে নদীর জলে। গতি যে তাকে ডাকে অগাধ সাগরের দিকে, মরণের রহস্যলোকে।

কবির মন বলে,—

ঐ শুক্নো পাতার তীর্থ-যাত্রায় সেও যাত্রী, তারও
প্রাণে ডাক এসেছে—সাগরের।

"Speak not 'gain, O Voice !
The Silence washes off sins :
Come not 'gain O Light !"

মনে পড়ে সৃষ্টির পূর্ব্ব রাত্রি...আলো নাই, শব্দ নাই, শুধু নিঃশব্দে অন্ধকারে অনন্ত প্রাণতরঙ্গ দোলে!

তারপরে শব্দ এলো, আলো এলো, এলো মানুষের কল-কোলাহল, জীবন ও জ্বালা, ব্যথা আর [illegible] সৃষ্টির পূর্ব্ব [illegible] ভুলে গেল মাটির মানুষ, শুধু মনে তার অস্পষ্ট আভাস রইল সুদূরের, বিরাটের নিঃশব্দ অনাদি প্রাণতরঙ্গের।

মাঝে মাঝে মন চায় শব্দকে অতিক্রম করে' আবার সেই নিঃশব্দের নিস্তরঙ্গ সায়রে লুপ্ত হয়ে যেতে; তাই সে

নিশীথে কেঁদে বলে, হে শব্দ, নির্ব্বাকের পক্ষপুটে আমাকে নিয়ে যাও আবার সৃষ্টির পূর্ব্ব রাত্রে!

বাইরের কোলাহল থেকে অন্তরের গভীর গুহায় মন ফিরে আসে, সেখানে বিরাজে অনন্ত নীরবতা; তারই স্পর্শে সব পাপতাপগ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। জীবন চায় অনন্তের সঙ্গ, নির্ব্বাণ!

কবি তাই বলেন,—

আলো নির্ব্বাপিত শিখার পক্ষপুটে আমাকে নিয়ে
যাও আলোর অতীত লোকে!

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে নোগুচি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি অন্যান্য জাপানী ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে আমেরিকা যান। আমেরিকা প্রবাসে নিদারুণ দুরবস্থায় তাঁর দিন কাটে। বহু দিন উপবাসে কেটে গেছে। দুঃখের রুদ্র দীক্ষাতে যৌবনের মন্দিরে সৃষ্টির দেবতা জাগে।

১৯০৯ সালে নোগুচি আমেরিকা পরিত্যাগ করে ইংলণ্ডে আসেন। এখানেও তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। এক জাপানী বন্ধুর সাহায্যে এই সময় নোগুচি দু'একখানি ছোট কবিতার বই প্রকাশ করেন। সে বইয়ের অবশ্য পাঠক নিতান্ত অল্পই জুটেছিল। "From the Eastern Sea" এই সময়ের লেখা। তার পরের বছরই তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ ক'রে নিউইয়র্ক হয়ে জাপানে ফিরে আসেন।

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক আন্দ্রিফ্‌ ইউরোপের সাহিত্যে যে নতুন প্রবাহ দেখেছিলেন তারই সমালোচনায় তিনি যা [illegible] নোগুচির জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তা সম্পূর্ণ ভাবে খাটে। [illegible] যে, আজ আমাদের জীবনের ধারা বদলে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনের [illegible] পরিমিত হয়ে এসেছে এবং তার জায়গায় আমাদের মনোজীবন আরও জটিল ও দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন যুগের কিংবা মধ্য যুগের জীবনের মত এখন জীবনে আর নিত্য অদ্ভুত ও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে না; কিন্তু মনোজগতে আজ নিত্য ভাবের অপূর্ব্ব বিপর্য্যয় ঘটছে! সেখানে অহরহ নব নব সমস্যা কঠিন সত্যের মত ফুটে উঠেছে। বর্ত্তমান সাহিত্য তাই মনোজীবনের দিকে ফিরে চায়।

নোগুচির কবিতা সেই মনোজগতের ইতিহাস, সেখানকার প্রতিটি জাগরণ, প্রতি চিন্তা, প্রতিটি স্বপ্ন কবিতার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে, তাই নোগুচির কবিতাই নোগুচির বড় পরিচয়।

অনাদি অন্ধকারের গূঢ়লোক থেকে সে বাহিরে এলো। প্রভাতের প্রথম আলোর কম্পনের মত রহস্যময়, সুন্দর, সম্পূর্ণ!

নিঃশ্বাসে তার প্রথম রজনীগন্ধার গন্ধ, নয়নে তার নক্ষত্রলোকের মায়া, আর আননে তার বায়ুর লীলা, শিরে তার শত সূর্য্যের জ্যোতি!

ছায়ায়-বোনা স্বপ্নের জালের উপর দিয়ে সে চলে। তার চলবার ভঙ্গীতে অনন্তের সঙ্গ-তৃষা গন্ধের মত ছড়িয়ে পড়ে।

ঊষার অরুণালোক বুঝি তার স্বদেশ, সন্ধ্যার বর্ণের সুর বুঝি তার ভাষা!

সে নীরব ভাষণে বলে, হে পথিক, হে বন্ধু, ধূলির মরণ-শয্যা হতে চলে যাই উর্দ্ধলোকে।

সে রহস্যময় মূর্ত্তিকে আমরা নোগুচির কবিতার মধ্যে দেখতে পাই। হয় ত সে কবি স্বয়ং নোগুচি। তাঁর কবিতার প্রতিছন্দে অনন্তের সঙ্গতৃষা সঙ্গোপনে জেগে ওঠে। নোগুচি আপনি আপনার কবিতার একটি প্রতীক রচনা করেছেন। সে প্রতীকের বন্দনায় তিনি গেয়েছেন—

গন্ধের স্বপ্নজালে মায়াবীর শয়ন দোলে!
কি নাম দেবো তার,—সেই আমার
কলালক্ষ্মী......
জীবনের পাত্রে কি বেদনার নিবিড় রস
উপচে পড়ে...
মুহূর্ত্তের মরণোৎসবে তার সঙ্গীত জাগে।
ইঙ্গিতেই তার প্রাণ...

নোগুচির কবিতা অহরহ ইঙ্গিতে আমাদের মনকে বস্তুর

জগতের উর্দ্ধে এক রহস্তময় অন্তর্জগতের পরিচয় দেয়। অন্তরের রহস্তলোক ছায়ার মতন নোগুচির কবিতার উপর পড়েছে।

এই রহস্তের স্পর্শে বস্তু আরো সার্থক হয়ে ওঠে, জীবন আরো গভীর হয়। ফুলের বিকাশের সঙ্গে, তারার কম্পনের সঙ্গে, একটি শুষ্ক পত্রের ঝরে-পড়ার সঙ্গে মন বাঁধা পড়ে যায়। জীবন সমস্ত সৃষ্টিকে এক ক'রে বেঁধে দেয়। নোগুচির কবিতা অনবরত বৃষ্টির বুদ্বুদের মত, প্রতি মুহূর্ত্তে বস্তুর জগতের সঙ্গে অতিন্দ্রিয় মনোজগতের একটা নিগূঢ় যোগ-সাধন করে দেয়।

তারার দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর মন তারা হয়ে কেঁপেছে, গন্ধের স্পর্শে তিনি গন্ধ হয়ে জন্মেছেন, গানের প্রেমে তিনি স্বয়ং সুরে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন।

বিখ্যাত চৈনিক দার্শনিক সোসি প্রজাপতির কথা ভাবতে-ভাবতে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের ধ্যান ভাঙবার জন্যে নিজেকে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন, তুমি কি সোসি, যে স্বপ্নে ভাবছিল যে, সে প্রজাপতি হয়ে গেছে; না, তুমি প্রজাপতি, যে ভাবছিল যে সে সোসি হয়ে গেছে।

নোগুচির কবিতার এই তন্ময়তা আমরা পরিপূর্ণ মাত্রায় দেখতে পাই—

> তোমাকে ছেড়ে সখি, এই পাইন্-বনের
> পথে একলা চলেছি।
> তোমাকে ছেড়ে সখি, এই তারায় ভরা
> ছায়াপথে একলা চলেছি।
> পাইন-পাতা পথের পাশে শিশির ঝরায়!
> চোখের পাতা পথের পাশে শিশির ঝরায়!
> ঘাসের উপর অশ্রু জলে!
> সে অশ্রু, না তারা?
> তুমি যদি হও নিশীথ তারা,
> আমি সখি, শিশিরবিন্দু...

নোগুচির কবিতা আমাদের রহস্তলোকের তীর্থপথের সাথী। সে তীর্থে পথঘাট মন্দির সোপান আমাদের বস্তুর জগতের জ্ঞানের বাইরে। বস্তুর জগতে আমরা দেখেতে পাই ততটুকু, যতটুকু এই চোখ যায়, ছুঁতে পারি ততটুকু, যতটুকু হাতের তলায় থাকে! বস্তুর কারাগারে আমাদের ইন্দ্রিয় বন্দী। সেই বন্দী ইন্দ্রিয় মুক্তি পায় ধ্যানীর ধ্যানে, কবির সাধনায়। তখন তার দৃষ্টির ও স্পর্শের সীমা অনন্তব্যাপী, তারার মৃদু পদধ্বনি তখন শ্রবণে আসে, গন্ধ তখন রূপ নেয়, শব্দ তখন স্পর্শ করে।

নোগুচির কবিতায় ইন্দ্রিয়ের সেই মুক্তি ঘটেছে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সেখানে কোলাকুলি করে। আলো ও ছায়ার পথ দিয়ে মন অনন্তের অভিসারে চলে। আকাশ আহ্বানের গানে তারায় তারায় ফেটে পড়ে।

> "I sail towards the chanting sky.
> O birds with white souls, steer my soul
> with white love,
> Here the sea of my dream, Oh, the beauty
> of the Inland sea"

—কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩৩

এ সুন্দরী পৃথিবীরে আমি ভালবাসি—

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

> ভালবাসি, ভালবাসি—
> এ সুন্দরী পৃথিবীরে আমি ভালবাসি
> সর্ব্ব দেহ মন প্রাণ দিয়ে—
> তাই তার তুচ্ছতম জীর্ণ পাতাটিরে
> ছেড়ে নাহি যেতে সরে মন;
> বুক দিয়া আঁকড়িয়া থাকি;
> নিশিদিন তার প্রতি অকিঞ্চিৎ বাণী
> লিখে রাখি মর্ম্মের পাতায়।

কোথা মোর গ্রন্থি বাঁধা
তার সনে, কেহ নাহি জানে
গোপন মরম তলে
কোন্ গূঢ় অন্তরঙ্গ ডোরে!
তাই দুজনার বুক এক সাথে
কাঁপে দুরু দুরু;
তাই আর নির্নিমেষ নয়নের
পড়ে না নিমেষ;
ছেড়ে' যেতে অশান্ত ক্রন্দন তাই।

তবু—
জানি আমি একদিন
স্তিমিত চোখের শেষ
অশ্রুভরা দৃষ্টিটুকু রেখে
ছেড়ে যেতে হবে।
শিথিল হাতের মুঠি
যাবে খুলে।
এই পরিচয় শেষ হবে।
এত চেনা এত জানাজানি,
কানে-কানে কওয়া কত চুপিচুপি কথা,
বুকে বুকে বয়ে যাওয়া বাসনার বেগ—
সব লয়ে চলে যেতে হবে।
বুঝি সেই বিদায়ের দিনটিরে স্মরি'
আজি পৃথিবীর চোখ
গোপন অশ্রুর ভারে করে ছলছল
তাই নিত্য আনন্দ উৎসব মাঝে
বিদায়ের সুর
হাসিটিরে করে সুমধুর,—সুকরুণ!

তাই
আরো কাছে সরে যেতে চাই;
ইচ্ছা করে সব বাধা ঘুচে যাক্;
তাহার ধূলার সাথে ধূলি হয়ে,
আলো হয়ে তার আলো সাথে,
মগ্ন হয়ে রই শুধু
অপূর্ব্ব আনন্দ-চেতনায়—!

ফাল্গুনের গন্ধ-ভরা ছায়ামাখা
আবেশে বিহ্বল দু'পহরে—
মনে পড়ে অকস্মাৎ, ছেড়ে যেতে হবে—
সেই বার্ত্তা আসে যেন ঝ'রে-পড়া মলিন পাতায়
জীবনের অবশেষ গানে।
মনে হয়—আজও আমি ভালো করে'
তাহারে যে চিনি নাই,
জানি নাই পাই নাই তাহারে যে প্রাণ ভরি',—
কেমনে এ অসমাপ্ত পরিচয় ফেলে রেখে
যাব চলি নিরুত্তর বিস্মৃতির মাঝে—?
আজও বাকি সব কথা,
অসম্পূর্ণ আজও সব গান,
রহস্য গুণ্ঠন খুলি' আজও প্রিয়া ভালো করি
দেখায়নি মুখ,—
আজো তারে বুঝি নাই!
অশ্রু-সাগরের দুই পারে
অন্তহীন বিরহের যুগ যুগান্তর
কাটাতে হবে কি লয়ে
এই শুধু অসম্পূর্ণ পরিচয়টুকু?
এক পারে প্রিয়া মোর
দুদণ্ডের জানা,
আর পারে আমি—
অশেষ বিরহী!

জীবনের দেবতারে কহি
এই যাওয়া এত সত্য যদি

তবে কেন দিলে ভালবাসা,
প্রিয়ারে পাঠালে কেন
দু'দণ্ডের তরে'
ভঙ্গুর এ খেলা ঘরে মিছে—?
কেন কণ্ঠে গান দিলে,
বুকে প্রাণ,
চক্ষে দিলে আলো,
কেন প্রেম দিলে?

জন্ম মৃত্যু এরা যেন দিন আর রাত্রি,
প্রাণ মম তার মাঝে যাত্রী যেন
চির অভিসারে!
প্রিয়া বুঝি চলে সাথে সাথে—
শুধু যবে অন্ধকারে
চিনিতে না পারি
কেঁদে কই—এই বুঝি শেষ!
বুঝি মোর চেনা হলো
তার সাথে বারে বারে নূতন করিয়া,
বারে বারে পাই তারে পুনঃ ছেড়ে যাই,
আবার নূতন করে' চাই
নূতন জীবনে!

কিন্তু বুঝি এই নয়—
বুঝি আমি বার বার আসিয়াছি
পৃথিবীর বুকে
বারে বারে ভালবাসিয়াছি!

তারে মোর হলোনাক চেনা
বুঝি এই অন্তহীন আনাগোনা হলোনাক
তাই পুরাতন!

—বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩৩

বোল্‌স্‌লাফ্‌

ম্যাক্সিম্‌ গোর্কি

সেদিন আমার এক বন্ধু বলছিল:

সে এক অদ্ভুত মেয়ে।

ঘরের পাশেই মেয়েটি থাকে। ছোট্ট একটি ঘর। তখন আমি মস্কোয় পড়ি।

বাড়ী তার পোলাণ্ডে। নাম—টেরেসা। লম্বা, জোয়ান,—কালো চোখের ভুরুদুটি বেশ টানা-টানা; চেহারাটা কেমন যেন শয়তানী-গোছের। পাথর থেকে কুঁদে যেন বার করা হয়েছে তাকে। চোখদুটো ভাসা-ভাসা, গলার আওয়াজ বেশ ঝাঁঝালো,—হাব-ভাব চাল-চলন দেখে মনে হয়, কারও সঙ্গে লড়্‌বে হয়ত। গাঁট্টা-গোট্টা ভারী চেহারা—ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ।

চোর-কুঠ্‌রির মত অন্ধকার ছোট-ছোট দু'খানি ঘর আমাদের ঠিক পাশাপাশি। মেয়েটা ঘরে আছে জানলে আমি আমার দরজা কখনও খুলতাম না।

হঠাৎ এক একদিন উঠোনে কিম্বা সিঁড়ির ওপর আমাদের দেখা হয়; দেখা হলেই সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে কেমন যেন একটা অবজ্ঞার হাসি হাসে।

মাঝে-মাঝে দেখতাম সে বাড়ী এলো,—চোখদুটো লাল, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো! এমন সময় চোখোচোখি হলেই বেহায়ার মত মেয়েটা একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকে; জিজ্ঞাসা করে, "কি গো! পড়ুয়া যে!"

তার দুষ্টু হাসি আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়।

মেয়েটাকে এড়াবার জন্যে অন্য ঘরে হয়ত উঠে যেতে পারতাম, কিন্তু জায়গাটা ভারি চমৎকার! শহর পর্য্যন্ত নজর চলে। সব-কিছু দেখা যায়। ভারি নির্জ্জন। পথের ওপর গোলমাল যেন একেবারে নেই বললেই হয়।

সকালে সেদিন কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে আছি—হঠাৎ দেখি, দরজাটা খুলে গেল।

চৌকাঠের ওপর টেরেসা দাঁড়িয়ে!

"কি গো পড়ুয়া!"

গলার আওয়াজ ভারি-ভারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি! কেন?"

মুখের পানে তাকালাম। মুখের ওপর কেমন যেন একটা হতভম্বের মত লজ্জার ভাব। তেমনটি কখনও দেখিনি।

"দেখ,"—সে বললে, "একটুখানি দয়া করবে? করবে ত? না……"

বিছানার ওপর শুয়ে-শুয়েই ভাবলাম এ একটা ছল মাত্র। কথা বললাম না।

সে আবার বললে, "বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখতে চাই।"

তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসলাম। কাগজ নিলাম, কলম নিলাম, বললাম, "বল কি লিখতে হবে। বসো ওইখানে।"

ঘরে ঢুকলো। ধীরে ধীরে বসে' সে আমার চোখের পানে খুব খানিক্‌টা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে লিখ্‌ব?"

"বোল্‌স্‌লাফ্‌ কাছেই। সুয়েন্‌জিয়ানীতে থাকে। রেলরাস্তার নাম ওয়ার্‌শ'।"

"কি লিখ্‌তে হবে? বল—শীগ্‌গির বলে যাও।"

"ভাই বোল্‌স্‌! প্রিয় আমার—প্রিয়তম আমার—সোনা আমার—মাণিক আমার! ভগবান তোমায় সুখে রাখুন! টেরেসার এত দুঃখু হয়েছে,—সেই টেরেসা—যাকে তুমি একটি ছোট্ট ঘুঘুর ছানা বলে' আদর করতে—সেই তাকে তুমি একবারটি মনে করে' এতদিন ধরে' কেন কিছু লেখনি লক্ষ্মীটি?"

আর একটু হলে তার মুখের ওপরেই হেসে ফেলেছিলাম। আহা, দুঃখে ম্রিয়মান ছোট এই ঘুঘুর ছানাটি!—এয়া মোটাসোটা লম্বা প্রায় ছ' ফুট, পালোয়ানের মত হাতের কব্জি, মুখখানি কালি-অন্ধকার,—'ঘুঘুটি' যেন সারা জীবন ভোর শুধু চিম্‌নি সাফ করেছে!

কোনরকমে মুখখানা গম্ভীর করে' রেখে বললাম, "বোল্‌স্‌লাফ্‌টি কে?"

সে একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল। বোল্‌স্‌লাফ্‌কে না-জানা—সকলের পক্ষেই সে-যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার। বললে, "কার কথা বলছ? বোল্‌স্‌? বোল্‌সের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে যে!"

"বিয়ের ঠিক্‌?"

বললে, "অবাক্‌ হয়ে গেলে নাকি? থাকবে না? ভালবাসার লোক থাকবে না—আমার মত কমবয়েসী মেয়ের?"

'কমবয়েসী মেয়ে'—কি আশ্চর্য্য!

"হতে পারে," আমি বললাম, "সবই সম্ভব। কতদিন ধরে চলছে তোমাদের?"

"দশ বচ্ছর।"

যাক্‌।

তার হয়ে চিঠি ত একখানা লিখে দিলাম।

এম্‌নি করুণ করে লিখলাম চিঠিখানা, আর এত ভালবাসার কথা থাকলো তাতে যে, আমারই বোল্‌স্‌লাফ্‌ হ'তে ইচ্ছে করছিল; কিন্তু চিঠিখানা যদি টেরেসা ছাড়া আর-কোনও মেয়ের কাছ থেকে আসতো……

দেখে মনে হলো, টেরেসা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। বললে, "কি বলে যে তোমাকে……আচ্ছা তোমার জন্যে আমি কিছু করতে পারি কি?"

"না। কিচ্ছু করতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে।"

"দেখ, তোমার কাপড়-চোপড় আমি সেলাই করে দিতে পারি!"

কথাটা ভারি বিশ্রী শোনালো। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, তার কোনও সাহায্যের দরকার আমার হবে না।

তখন সে চলে গেল।

দু'হপ্তা পেরুলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জানালায় বসে বসে আপনমনেই শিশ্‌ দিচ্ছি; ভাবছি, কি করা যায়। বাইরে বিশ্রী আবহাওয়া,—বেরোতে ইচ্ছে করে না।

হঠাৎ দরজা-খোলার শব্দ হলো।

ভাবলাম, কেউ আসছে হয়ত!

"তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ?"

টেরেসা। আর কেউ হলে যেন ভাল হতো।

"না। কেন?"

"আর একটি চিঠি তোমায় লিখে দিতে হবে।"

"বোল্‌সের কাছে?"

"উঁহু! আমি তার জবাব চাই—"

বললাম, "সে কি!"

"দেখ, কিছু মনে করো না। বুদ্ধিশুদ্ধি আমার তেমন নেই। পরিষ্কার করে আমি নিজেকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। ধর—এবার যেন আর আমার হয়ে নয়—আমার এক বন্ধুর হয়ে;—বন্ধুও ঠিক নয়, পরিচিত। ধর—সে-লোকটি যেন লেখাপড়া কিছু জানে না—আমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে ধর যেন তার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছে—"

মুখ তুলে তার মুখের পানে তাকালাম। তার লজ্জা হলো। কেমন যেন সে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। হাতদুটো তার কাঁপছিল। মনে হলো তার মনের ভাব আমি টের পেয়েছি।

বললাম, "বুঝেছি। সব তোমার মিছে কথা। তোমার কথা—বোল্‌স্‌লাফের কথা—সব তোমার মন-গড়া। এখানে আসবার জন্যে শুধু ছল খুঁজে বেড়ানো। যাও—তোমার জন্যে আমি আর কিছু করতে পারব না—যাও!"

দেখলাম সে ভয় পেয়েছে। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো; কিছু বলবার জন্যে হাঁকুপাকু করছিল।

মনে হলো, মেয়েটাকে যেন ভুল বুঝলাম। বোধ হয় সে সেজন্যে আসেনি। আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার ইচ্ছে বোধ করি ওর নেই। হয়ত' আর কিছু......কিন্তু কি?

বললে, "শোনো"—বলেই কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। সশব্দে তার দরজা বন্ধ করবার শব্দ আমার কানে এলো।......রেগেছে। ভাবলাম, ডেকে নিয়ে আসি মেয়েটাকে। চিঠি আমি ওর লিখে দেব। ভারি কষ্ট হলো মেয়েটির জন্যে।

গেলাম। হাতে মুখ রেখে টেবিলের কাছে বসেছিল সে।

বললাম, "দেখ, তুমি—"

কথাটা শুনবামাত্র মেয়েটা যেন লাফিয়ে উঠলো। চোখদুটো তার জ্বলছিল। হঠাৎ সে আমার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো। বুক যেন তার ভেঙে যাচ্ছে!

"কী এমন ক্ষতি হয় তোমার—ওই কটা লাইন—লিখে দিতে? সত্যি তুমি ভারি ভালমানুষ!—হ্যাঁ, ঠিক্‌ কথাই ত—বোল্‌স্‌লাফ্‌ বলে কেউ নেই—নেই-ই ত!—টেরেসাও নেই। শুধু আমি—আমি শুধু—আমিই আছি।"

কথা শুনে হঠাৎ যেন আমি চমকে উঠলাম।

"কি! কি বললে? বোল্‌স্‌ বলে কেউ নেই তাহ'লে?"

"না।"

"টেরেসাও না?"

"না। আমিই টেরেসা।"

মাথাটা যেন ঘুরছিল। তার মুখের পানে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলাম।

টেবিলের কাছে সে ফিরে গেল; ড্রয়ারটা টেনে ধরে একটা কাগজ সেখান থেকে বের করে আনলে।

আমার কাছে ফিরে এসে বললে, "এঁ,—এই নাও। আমার জন্যে যে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলে—এই নাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার চিঠি।—আর তুমি লিখে দেবে না, কেমন? না দাও, অনেক লোক আছে—এ দয়াটুকু যারা অনায়াসে করবে।"

বোল্‌স্‌লাফের জন্যে যে চিঠিখানা আমি লিখে দিয়েছিলাম সেটা তখনও তার হাতে, ব্যাপার কি? বললাম,

"শোনো টেরেসা, এ সবের মানে কি বল ত? এ চিঠিখানা এখনও তুমি পাঠাওনি; আর এরই মধ্যে আবার তুমি চিঠি লেখাতে চাও কেন বল দেখি?"

"কার কাছে পাঠাব চিঠি?

"কেন, বোল্‌স্‌লাফের কাছে—"

"কিন্তু সে নামের লোক ত কেউ নেই।"

এবার আমার চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু সে আবার বললে, "না, বোল্‌স্‌লাফ্‌ বলে কেউ নেই।"—এমন ভাবে কথাটা বললে, মনে হলো যেন বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। "কিন্তু আমি চাই সে থাকুক্‌। আমি কি—তা আমি জানি। আর সব কারুর মত আমি নই। কিন্তু তবু যদি আমি তাকে লিখি ত' কার কি আসে-যায়?"

"কাকে? কি বলছ তুমি?"

"বোল্‌স্‌লাফকে।"

আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। "বা, এখনই যে বললে—সে নামের কেউ নেই?"

"ও মা! নাই-বা থাকলো! তাতে আমার কি? নেই, তা আমি জানি। আমি কিন্তু মনে-মনে ভাবি, বোল্‌স্‌লাফ্‌ [illegible]-কেউ-হোক্‌ আছে। আছে মনে করে চিঠি লিখি—সেও জবাব দেয়। [illegible]আবার লিখি—আবার জবাব দেয়।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলাম। ভাবলাম, সত্যি অপরাধ করেছি। লজ্জা হলো। মনে হলো সর্ব্বাঙ্গে যেন বেদনা বোধ করছি। আমারই পাশে, হাতের কাছে একান্ত সন্নিকটে, এমন এক বেচারা মানুষ বাস করে—সারা দুনিয়ার মধ্যে এতটুকু স্নেহমমতা করবার যার আর কেউ নেই;—মা-বাপ নেই—বন্ধু নেই—কেউ নেই! আর তাই সে অভাগী আবিষ্কার করেছে—মনে-মনে শুধু আবিষ্কার করেছে এমন একজন লোক—যে তাকে অন্তত ভালবাসতে পারে—সে যেন তার বর—সে যেন তার স্বামী!

মেয়েটি আবার তার সেই একঘেয়ে গম্ভীর গলায় বলে যেতে লাগলো, "এই যে চিঠিখানা তুমি বোল্‌স্‌লাফ্‌কে লিখে দিয়েছিলে, আর-একজনকে বলেছিলাম, বলি, পড়—খুব জোরে-জোরে পড় ত' চিঠিখানা!……আমি শুনেছিলাম আর ভাবছিলাম, বোল্‌স্‌লাফ্‌ আছে। তাই আমি তোমাকে আবার বলেছিলাম এর একটা জবাব লিখে দিতে—বোল্‌স্‌ যেন তার টেরেসাকে লিখছে,—তার মানেই, আমাকে। আমার ঠিক মনে হয় বোল্‌স্‌লাফ্‌ আছে। কোথায়—ঠিক তা জানি না। তবে মনে হয়, আছে কোথাও—নিশ্চয়ই। আর সেই ভেবেই ত' আমি টিঁকে আছি কোন রকমে। এখন আর তাই বেঁচে থাকা আমার পক্ষে খুব যে একটা শক্ত কাজ—তা নয়। একা থাকি, তা যেন মনেই হয় না।"

তারপর—

তারপর, সেই দিন থেকে, হপ্তায় ঠিক দুবার করে' আমি তার চিঠি লিখে দিয়েছি। টেরেসা যেন বোল্‌স্‌কে লিখ্‌ছে, আর বোল্‌স্‌ টেরেসাকে। চিঠিগুলো এমনি অনুরাগের সঙ্গে লিখতাম—এত ভাল করে'—বিশেষত জবাব গুলো। আর ওই মেয়েটি,……মেয়েটি শুনতো, আমি পড়তাম। সে কাঁদতো,—ফুলে' ফুলে' কাঁদতো; হাসতো,—ভারি খুশী হতো।

এর বদলে সে আমার কাপড়-চোপড়গুলো দেখা শোনা কর্‌তো, ছেঁড়া মোজা, ছেঁড়া কামিজ সেলাই করে' দিত, জুতোগুলো পরিষ্কার করতো, আর ধূলো ঝেড়ে' টুপি সাফ্‌ করে' দিত।

মাস-তিনেক্‌ পরে কি যেন সন্দেহ করে' পুলিশ তাকে ধরে' নিয়ে গেল, তারপর জেলে পুরে রাখলে।

পরে আর তার দেখা পাইনি।

বোধ করি এত দিন মরে গেছে।